SHARODIYA LIPIKA

OCTOBER 2021
আশ্বিন ১৪২৮

শারদীয়া লিপিকা

VOLUME 15 AUTUMN ISSUE
পঞ্চদশ বর্ষ ১ম সংখ্যা

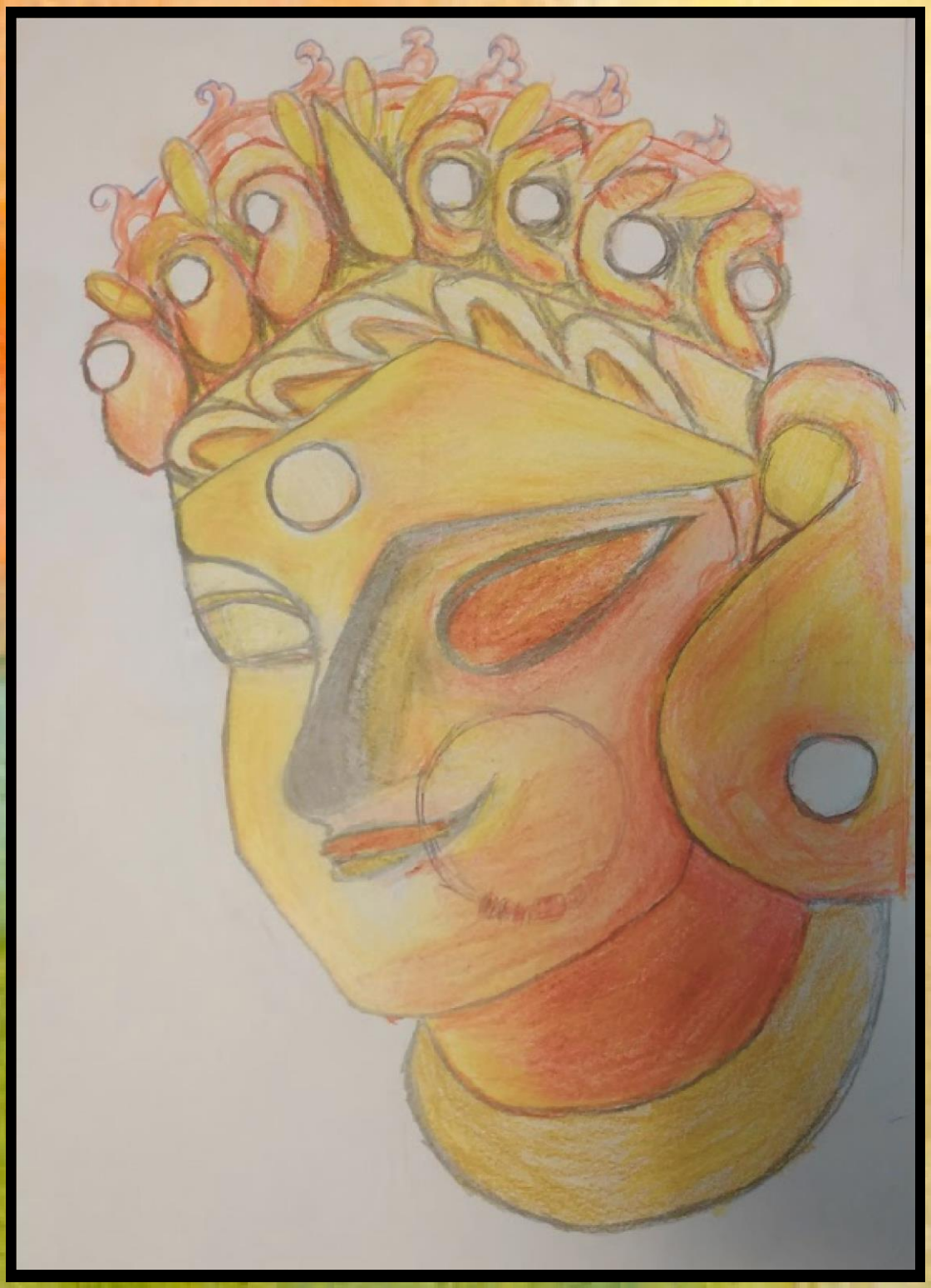

EDITOR
DR. JHARNA CHATERJEE

COORDINATORS
LATE ADITYA CHAKRAVARTI
SUBHANKAR PANDIT
SUPARNA MAJUMDAR

WEB MASTER
TANIMA MAJUMDAR

COVER DESIGN
REETO GHOSH

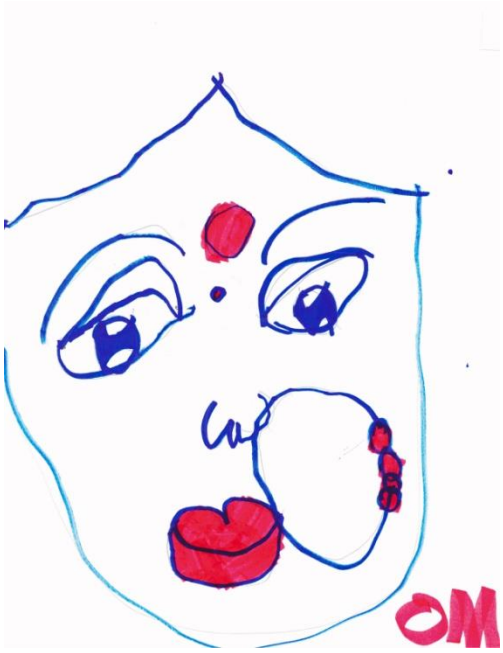

Ma Durga by Om Mukherjee, Age-6

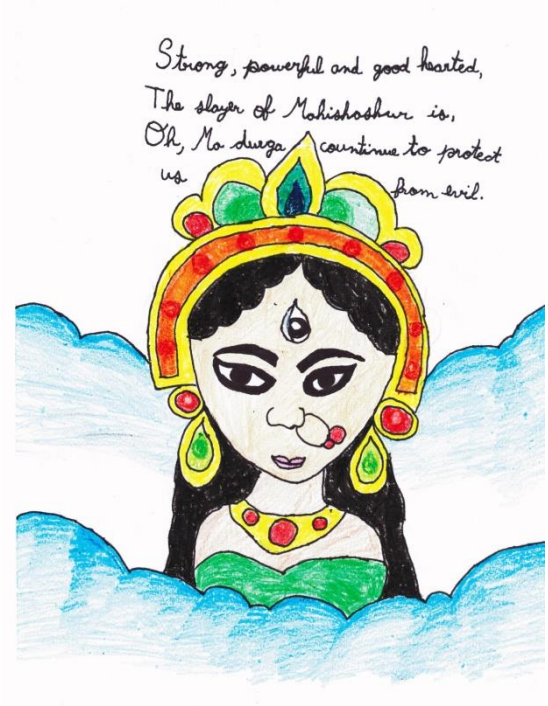

Ma Durga by Vidita Mukherjee Age-10

আঁকা – অনুষা সরকার (বয়স- ১০)

ঋত ঘোষের (বয়স - ১৬) আঁকা পাখীর ছবি

Table of Contents

Vidisha and Om's Ma Durga paintings inside cover page

Anusha Sircar's and Reeto Ghosh'a paintings

Editorial

In Aditya's Memory - Jharna Chatterjee

Deshantari President's message - Anindya Choudhury

Two sonnets - Ruma Basu

Baul gaan - Arun Roy

Aamar rajar bari - Anindya Ganguly

Bhopal and surroundings - Subhash Biswas

Maheswar and Omkareshwar - Subhash Biswas

Teej - Suparna Majumdar

Trip to Norway - Gour Seal

It happened one summer - Subha BasuRay

Covid, Cycle and I - Indrani Choudhury

Canadian Land Mass and Water- a Killer - Nirmal Sinha

Gol male gol (incomplete) - Aditya Chakravarti

Gol niye golmal - Aditya Chakravarti

Khai khai bicchu - Sanghamitra Chakraborti

Badoler ak din - Madan Mohan Ghosh

Ayna - Jharna Chatterjee

Jokes

Korean Dramas - Shaony Disha Chakraborti

Book Thief (book report) - Sparsha Chakraborti

Curiosity about curiosity - Aheli Banerjee

Two paintings - Anusha Sircar

Two exotic birds (paintings) - Reeto Ghosh

Pictures through water - Yogadhish Das

Puja pictures from three cities - Tanima Majumdar

সূচীপত্র

বিদিশা আর ওম মুখার্জীর আঁকা ছবি মা দুর্গা

অনুষা সরকার ও রীত ঘোষের আঁকা ছবি

সম্পাদকীয়

আদিত্যর স্মরণে – ঝর্ণা চ্যাটার্জী
সভাপতির কলম থেকে – অনিন্দ্য চৌধুরী
দুটি কবিতা – রুমা বসু
বাউল গান –অরুণ শঙ্কর রায়
আমার রাজার বাড়ি – অনিন্দ্য গাঙ্গুলী
ভোপাল ও আশে পাশের অঞ্চল – সুভাষ বিশ্বাস
মহেশ্বর ও ওঙ্কারেশ্বর – সুভাষ বিশ্বাস
তীজ – সুপর্ণা মজুমদার
নরওয়ে অভিযান – গৌর শীল
একটি গরমের দিনের ঘটনা – শুভা বসুরায়
কোভিদ, সাইকেল আর আমি – ইন্দ্রাণী চৌধুরী
ক্যানাডার ভূখন্ড আর জল – মারাত্মক – নির্মল সিনহা
গোল মালে গোল (অসম্পূর্ণ) – আদিত্য চক্রবর্তী
গোল নিয়ে গোলমাল (পূর্ব প্রকাশিত) – আদিত্য চক্রবর্তী
খাই খাই বিচ্ছু (অনুবাদ) – সংঘমিত্রা চক্রবর্তী
বাদলের এক দিন – মদন মোহন ঘোষ
আয়না – ঝর্ণা চ্যাটার্জী
হেসে নাও দুদিন বৈ তো নয় (সংগ্রহ)
কোরিয়ার ড্রামা – শাওনি দিশা চক্রবর্তী
বুক থীফ (বইএর কথা) – স্পর্শ চক্রবর্তী
কৌতূহল নিয়ে কৌতূহল – আহেলী ব্যানার্জী
দুটি ছবি (আকা) – অনুষা সরকার
দুটি পাখির ছবি (আঁকা) – রীত ঘোষ
জলের মধ্য দিয়ে তোলা ছবি – যোগাধীশ দাস
তিন শহরে দুর্গা পূজা– তনিমা মজুমদার

সম্পাদিকার চিঠি

প্রিয় লিপিকার পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ,

এ বছরে বিষাদের আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের 'লিপিকা'র নৈবেদ্য সাজাতে চলেছি।

গত বছরে অতিমারীর প্রকোপে প্রতি বারের মত মহা সমারোহে দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয় নি, এবারে আশা করছি সবাই মিলে মিশে দুর্গতিনাশিনীকে আবাহন করা সম্ভব হবে। আদিত্যকে হারাবার পরে শুভঙ্কর পন্ডিত ও সুপর্ণা মজুমদার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আদিত্যর কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য। তনিমা মজুমদার আশ্বাস দিয়েছে ওয়েবে তোলার দায়িত্ব সে নেবে। সময় খুব কম, তাই ভুল ত্রুটী থেকে যাওয়া সম্ভব। ক্ষমা প্রার্থনা করছি তার জন্য।

অন্যান্য বছরের চেয়ে অনেক কম লেখা ও আঁকা পেয়েছি এবারে। কেউ কেউ পরপারে, কেউ বা লিখতে সমর্থ নন এখন আর। ভবিষ্যতে অন্যেরা সেই স্থান পূর্ণ করবে আশা করি। অতি মনোরম ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন কয়েক জন। সুন্দর কবিতা, গান ও ছোট গল্প এসেছে। প্রবন্ধও এসেছে। ছোটরা পাঠিয়েছে লেখা আর আঁকা। অতি সুন্দর প্রচ্ছদ এঁকেছে রীত ঘোষ। এদের অতি ব্যস্ত দিনের মধ্য থেকে সময় করে নিয়েছে এরা। এই সামান্য আয়োজন সবার ভাল লাগলে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সফল হবে। দেশান্তরীর প্রেসিডেন্ট অনিন্দ্য চৌধুরীর ও কিশোরী শাওনি চক্রবর্তীর উদ্যম ও সহায়তার বিশেষ প্রশংসা করি।

সবার কাছে আবেদন রইল আগামী বছরে উৎসাহের অভাবে আদিত্যর এত আদরের "লিপিকা" যেন শেষ না হয়ে যায়। লিপিকা প্রধানতঃ "ওয়েব ম্যাগাজিন" – কিন্তু আমরা প্রতি বছরেই চেষ্টা করি কিছু কাগজ-কালির কপি ছাপতে যাতে কম্পিউটারের সুবিধে যাঁদের নেই তাঁরাও এই পত্রিকা উপভোগ করতে পারেন।

পূজার অনুষ্ঠানে লিপিকার কর্মীদের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভকামনা জানাই।

ঝর্ণা চ্যাটার্জী

সম্পাদিকা, লিপিকা

Om Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Nir-Aamayaah |
Sarve Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Letter from the Editor

Dear Lipika readers,

It is with a heavy heart we are preparing to publish Lipika this year. It is not easy to fill Aditya's shoes, but Subhankar Pandit and Suprna Majumdar have graciously extended their helping hands to complete the work. Tanima Majumdar has kindly agreed to be the webmaster. Under the circumstances, please forgive all our mistakes and errors.

We have received stories, travelogues, poems and other items from various talented participants – written from a multitude of perspectives. Some of our regular contributors have passed away, and some others are incapable to write now. Hopefully, others will take over and fill this gap. The writings and drawings from our young members are always impressive, and I am sure everyone will feel proud to see them. Reeto Ghosh has designed the Cover Page. These youngsters had to squeeze time away from their busy schedule to send in their submissions.

Especially for Aditya's sake, I would like to remind everyone that without sufficient support and enthusiasm, Lipika may not survive beyond this year.

Although Lipika is primarily a 'web magazine', we try to print a few paper-copies every year for the convenience of those who may not have access to or do not feel comfortable with digital copies.

On behalf of Lipika team, I would like to wish everyone our best wishes for Durga Puja festivities, after our COVID-generated social 'starvation' of a year and half without a proper Durga Puja celebration.

Jharna Chatterjee

Editor, Lipika

May all become happy
May none fall ill
May all see auspiciousness everywhere
May none ever feel sorrow
Om Peace, Peace, Peace!

Note: Views expressed in Lipika represent the writers' views. The Lipika team is not responsible for them. Any factual inaccuracy or printing mistakes are unintentional.

In Memory of Aditya Chakravarti

Dr. Jharna Chatterjee

I am writing about the man who conceived the idea of Deshantari's own e-magazine "Lipika" in 2006, and loved "Lipika" like another child of his own. Aditya and I worked hand in hand together for more than a decade to bring Lipika to the readers of Deshantari. He used to ask me every year if I will take the responsibility of being the Editor, and I used to reply "Yes, if you are the Co-ordinator." And both of us laughed and agreed to work as a collaborative, two-person team. We were also assisted by a webmaster and a cover-designer for producing the final publication – not necessarily the same always.

He became the President of Deshantari the year after I was, and we used to discuss various ideas to make our Association more service-oriented. Lipika was one of them. His other important contribution to Deshantari's activities was introducing an annual "walk-a-thon" to raise funds for charity.

Aditya always had a smile on his face, loved jokes, and also loved acting in ‘comic’ roles in dramas. Every year, he also wrote a funny piece for Lipika, filled with alliteration and puns. Sometimes it was based on some personal anecdotes from his childhood in Bhagalpur, sometimes mixed with anecdotes from the literature, such as is much admired Shibram Chakravarti’s immortal writings. Let me present one of his stories here:

A man approached a lawyer and said “Sir, I stole a case of Scotch Whiskey and got arrested. Sir, would you be willing to take this case?” The lawyer got up from his chair, and said to this man in a sweet voice, “Definitely. So where is this case of Scotch Whiskey now?”

Last but not the least, on a personal note: I had known Aditya for the last 40 years as a younger brother, through bright sunshine and rainy, stormy days. Many years ago, one day he called me (pre-cell phone days) to confide about his emotional distress. I was attending a ladies’ lunch at that time, but I called my husband immediately and asked him to bring Aditya over to our home, and to make sure he was not left alone to deal with his stress all by himself. Then, over time, gradually he became established in his happy family life, and I was dealing with my own existential challenges. During that time, we drifted apart slightly.

“Lipika”, his visionary daughter, brought us closer together again and we worked hand in hand as a two-person team for more than a decade.

In his own biological family, he was the youngest, much adored baby brother – and I too could not think of him in any other way. He will be deeply missed by all of us who knew him. However, I am quite sure, he is having fun entertaining all the gods and angels with his jokes and laughing all day.

.

সভাপতির কলম থেকে

বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো তার আপন বর্ণাঢ্যতায়, মহিমায় সারা বিশ্বে গৌরবোজ্জ্বল! মহালয়ার পরদিন মাতৃপক্ষ থেকে শুরু হয়ে যায় বাঙ্গালীর মাতৃ- আরাধনা! প্রবল পরাক্রমশালী মহিষাসুরমর্দিনী দশভুজা মা কে আমরা দেখি আমাদের ঘরের মেয়ের মত; মা তাঁর শ্বশুরালয় হিমালয় থেকে চার পুত্রকন্যা নিয়ে ন-দিনের জন্য নেমে আসেন বাপের বাড়ি এই পৃথিবীতে। দশদিনের মাথায় মা-এর বিসর্জনের সাথে মাকে 'আসছে বছর আবার হবে' বলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁর শ্বশুরালয়। ঘরের মেয়ে ঘরে আসাতে যেরকম আনন্দ-উৎসব শুরু হয়ে যায়, ঠিক সেরকমই আমাদের দুর্গাপুজো নিয়ে হইচই, মাতামাতি! এই উৎসব যতটা না ধর্মীয়, সেইরকমই তাৎপর্যপূর্ণ এর সামাজিক দিক, বাঙ্গালী ঐতিহ্যের সংগে এর যোগ! মা-এর পুজো, অঞ্জলির পাশাপাশি মা-কে ঘিরে খাঁটি এবং সাবেকী বাঙ্গালীয়ানায় সাজগোজ, পোষাক-আসাক, গানবাজনা, খাওয়া-দাওয়া- এই সবকিছু নিয়েই আমাদের দুর্গাপুজো! দেশ থেকে হাজার-হাজার মাইল দূর প্রবাসে থাকলেও আমাদের আনন্দ-উৎসাহ-উত্তেজনায় কোন কমতি নেই, বরং বলব আরো বেশি আছে- আমাদের যে পরবর্তী প্রজন্মকে তৈরী করতে হবে, তাদেরকে দিয়ে যেতে হবে বাঙ্গালীয়ানার উত্তরাধিকার।

দেড়-বছর ধরে কোভিডের প্রকোপে আমরা গত বছর মা-য়ের পুজো সাধ মিটিয়ে করতে পারিনি; বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই, ল্যাপটপের পর্দায় দর্শণ ও পুজো দিয়ে ক্ষান্ত থেকেছি! এ বছর, দুটো কোভিড ভ্যাক্সিনের পর এবং এই দেশে এই রোগ অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসায়, আমরা সমস্ত বিধি-নিষেধ মেনে মা কে আমাদের কাছে আনছি। বড়ই আনন্দ, আবেগ মেশানো আমাদের এই অনুভূতির কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায়না; অনেকদিন অনেকের দেশে যাওয়া হয়নি, এই দুর্গাপুজো আমাদের সেই আক্ষেপ ভুলিয়ে দিচ্ছে। মাতৃভূমি সমতূল্য মা স্বয়ং আমাদের কাছে আসছে- আসুন আমরা শোক-দুঃখ ভুলে, ছোট-বড় সবাই মেতে উঠি বাঙ্গালিদের একান্ত আপন, প্রাণের চেয়েও প্রিয় দুর্গোৎসবে! এর সাথে ভুলবেননা, এ বছর দেশান্তরীর দূর্গোৎসবের ৪০ বছর পূর্তি - এর ঐতিহ্য আমাদের মিলিত গর্ব ও সম্মানের! ছোট ভুল-ত্রুটি নিজগুণে মার্জনা করে দেবেন। সর্বমঙ্গলদায়িনী মা- এর কাছে সবার মঙ্গল প্রার্থনা করি! ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন।

নমস্কার

ডঃ অনিন্দ্য চৌধুরী

সভাপতি, দেশান্তরী

From the President's Desk (Translation by Dr. Jharna Chatterjee)

Bengalis' greatest festival Durga Puja, has taken its place of glory in the entire world with its colourfulness and magnificence. Every year, the worship of Mother Durga starts the day after Mahalaya, during matri-pokhsho (mother's fortnight). We Bengalis look upon this ferocious ten-armed goddess, the slayer of the buffalo monster as our daughter; she comes from her husband's house in the Himalayas to the earth, to her parental home with her four children, for nine days. On the tenth day, we immerse the image with the loving message "We will see you again next year", and send her off to her husband's home. The excitement-filled festivities reflect the joyous atmosphere typical of a married daughter's home-coming. These festivities are more meaningful from a socio-cultural perspective, than from a religious one. Around Mother's multi-faceted

worship, genuine, traditional attires, make-up, musical programs, feasts – all this constitute our Durga Puja. There is no inadequacy in our joy and enthusiasm, even when we are thousands of miles away from our motherland, rather it is perhaps greater, because we have to teach our next generation, and pass on the torch of Bengali culture.

Due to the pervasive invasion of COVID during a year and half, we could not observe these festivities last year properly. We had to stay indoors, and observe the occasion, as we watched this on our laptops. This year, after double vaccination of most eligible participants, COVID statistics have taken a downward trend. So, we will bring Mother among ourselves and resume our festivities - within all necessary regulations.

It is difficult to explain the ecstatic feeling and emotion. Many of us have not been able to visit our motherland for a long time. Our Durga Puja is helping us to forget that regret. Ma, similar to our motherland is coming to us herself. Let us forget all our grief and sorrow, let us get into the joyous celebration of Bengalis' own, extremely dear festival of Durga Puja.

Please do not forget that this year marks Deshantari's 40th year of Durga Puja. This is an honour and pride for us all. Please forgive small mistakes. I pray to the Mother, abode of all auspiciousness, for the well-being of all. Stay well, stay happy.

Greetings,

Dr. Anindya Choudhury,

President, Deshantari

মহিষাসুরমর্দিনী

রুমা বসু

১) শারদীয় দুর্গা পূজা শুরু এ' ধরায়,
রামচন্দ্রের অকালেতে বোধনের জন্যে,
বাপের বাড়িতে এসে শারদে বেড়ায়,
শিবের অনুমতিক্রমে হিমালয় কন্যে।

লক্ষ্মী সরস্বতী আর কার্তিক গনেশে,
শিব-পার্বতীর মাতৃ ভক্ত ছেলেমেয়ে,
ধরায় আসে শরতে মায়ের আদেশে,
মাতুলালয়ে চারদিন থাকে তারা যেয়ে।

হিমালয়-মেনকার কন্যা এ' সরিতা,
রূপবতী গুণবতী অসুর দলনী,
বধিয়া মহিষাসুর দেবী মহাশ্বেতা,
মহিষাসুরমর্দিনী যে নাম চিরদিনই।

কৌশিকীর প্রতিবার মর্তে আগমন,
আনন্দতে পূর্ণ করে ভূবাসীর মন॥

২) কর্মের অমরত্ব

জন্মের সাথে সাথেই মৃত্যু থাকে লেখা,
প্রাণ থাকলেই তার অবসান হবে।
জীবনের অমরত্ব না যায় যে দেখা
এ'ভুবনেতে অমর হয়েছে কে কবে?

নশ্বর শরীর মিলে যাবে পঞ্চভূতে
শরীরের মৃত্যু হবে অনিবার্য সাঁঝে,
কর্ম শুধুমাত্র পারে অমরত্ব দিতে,
অমর হয় মানুষ কৃতকার্য মাঝে।

কর্ম মাঝে নির্ধারিত সব আয়ুষ্কাল,
জীবনের ঘড়া যার পুণ্য কর্মে ভরা,
মানুষের মাঝে বাঁচে সে অনন্তকাল,
মনোযোগ থাকে যার সৃষ্টি কর্ম করা।

দেহ রক্ষা মাঝেতে না করে অশ্রুপাত,
কাজ মাঝে করতে হয় যে কালাতিপাত॥

বাউলগান

অরুনশংকর রায়

খেজুরগাছে ভাঁড় বেঁধেছি গুরু
তোমার নামটি স্মরণ ক'রে।
কৃষ্ণপ্রেমের ভক্তিরসে
মন-গাগরি নিচ্ছি ভ'রে।
খেজুরগাছে ভাঁড় বেঁধেছি গুরু
তোমার নামটি স্মরণ ক'রে।

তবু হায় মন না বোঝে,
অহরহ খেজুর খোঁজে,
ঘুরে মরি অন্ধকারে
দিনেরাতে মায়ার ঘোরে।
খেজুরগাছে ভাঁড় বেঁধেছি গুরু
তোমার নামটি স্মরণ ক'রে।

তবু হায় অহর্নিশে
মন পড়ে রয় বিষয়বিষে,
আলোর দিশা দেখাও গুরু,
ও পথ আর কতদূরে ।
খেজুরগাছে ভাঁড় বেঁধেছি গুরু
তোমার নামটি স্মরণ ক'রে।

*****

আমার রাজার বাড়ি

অনিন্দ্য গাঙ্গুলি

কতটা শ্যাওলা পড়ল ছাদের উপর?
কতটা ঝুল পড়েছে চিলেকোঠায়?
কতগুলো ডাল কেটেছে আবার ওরা?
বলো তুমি কেমন আছো পাঁচিল ঘেরা

কতটা জল জমেছে বৃষ্টিবেলায়?
কতটা জীবন বেঁচে ফণিমনসায়?
কতটা সবুজ আছো আমায় ছাড়া?
কতটাই বা মলিন হলে পাগলপারা

কেমন করে সুখের পাখি
তোমার সাথে গল্প করে?
আর কি এখন দোয়েল আসে
শীতেরবেলা অন্ধকারে?

কারা এখন সঙ্গ দেয়?
তোমায় কারা ছায়ায় ঢাকে?
নতুন কারা এল পাশে?
পাঁচিল দিল দেওয়াল ঘেঁষে?

লাটাই-টা কি হারিয়ে গেছে?
সিঁড়ির নীচে খুঁজে দেখো
যদি দেখ ভেঙ্গেই গেছে
বইয়ের তাকে গুছিয়ে রেখো।

আর কি কি বলবে আমায়?
হিসেব রেখো নিজের কাছে -
তুমিও কিন্তু জেগে থেকো
আসবো আমি অনেক রাতে।

Bhopal and surroundings

Dr. Subhash C. Biswas

Where royal Vidisha confers renown
The warmest wish shall fruit delightful crown;
There, Vetrabati's stream ambrosial laves
A gentle bank, with mildly murmuring waves;
And there, her rippling brow and polished face
Invite thy smiles, and see for thy embrace.

Behold the city whose immortal fame
Glows in Avanti's or Visala's name!

Renowned for deeds that worth and love inspire,
And bards to paint them with poetic fire;
The fairest portion of celestial birth,
Of Indra's paradise transferred to earth.

From *Meghadutam* by *Kalidas*, translated by H. H. Wilson

In his classic poem "*Meghadutam*", the legendary poet Kalidas described the beauty of Madhya Pradesh with poetic elegance. He was so captivated by the bounty and beauty of this region that he expressed his feelings in true poetic excellence through his fancied character, an exiled *Yaksha*, who addressed his messenger, a cloud, requesting him to visit all the fascinated places on its way. Madhya Pradesh has retained its pristine beauty till today. Along with a great historical past and a rich culture, Madhya Pradesh is home to many breathtakingly beautiful landscapes and natural wonders. Sacred rivers like Narmada, Shipra and Betwa wash this land and the mountain ranges like the Vindhyas, the Satpuras and the Maikal Hills near Amarkantak guard this land since the ancient times. Forests, rivers, rich heritages, natural resources, wild life sanctuaries and cultural diversity make this land a land of splendors. Tourists in great number from all over the world come to visit Madhya Pradesh every year.

Known as the "City of Lakes", Bhopal is the capital of Madhya Pradesh. Scenic beauty, rich history and modern urbanization distinguish this city as one of the remarkable cities of India. The newly developed part of the city bustles with beautifully disposed parks and gardens and broad avenues lined with elegantly designed modern office buildings.

Originally, Bhopal was known as Bhojapal which was founded by the Malwa King Bhoja in the eleventh century. The modern Bhopal was however founded in the eighteenth century by Dost Mohammad Khan who was an Afghan soldier in the Mughal army. During the chaotic period that followed the death of the Mughal Emperor Aurangzeb, Dost Mohammad fled Delhi and started providing mercenary services to local kings. The Gond queen Kamlapati received this service from Khan in lieu of the territory of Bhopal. Today, Bhopal has a multifaceted profile. It still boasts of the noble legacies of its former rulers, its traditional marketplaces and fine old mosques.

In the month of January, Godadhar and Kamalika set out for this marvelous state bustling with ancient glory. They arrive at the Bhopal airport in early afternoon, where they are received by the representative of the travel company. From there, they are driven to the destined hotel which is the palace of a Nawab converted to a hotel. Their itinerary consists of the important places in the western part of Madhya Pradesh. From Bhopal, they will go to Omkareshwar on the bank of Narmada stopping at Ujjain, Indore, Mandu and Maheshwar. The city of Bhopal and its surroundings are the first places to visit.

The tour begins in the morning of the following day. Mohammad Ibrahim, a young man in his thirties, is the chauffeur; he is ready with the car. The morning sun shines brilliantly over the Upper Lake reflecting a panoramic view of Bhopal, visible from the hotel. Mohammad starts the car and drives towards Sanchi. Bhopal used to be a fortified city with many gates during the reign of Dost Mohammad Khan. Seven of these Gates are still standing on the ground. The car passes through some of them like the Bhopal Gate and the Islamic Gate. All these Gates are in a dilapidated state badly needing proper renovation.

Mohammad drives through the city and while passing through its outskirts, he stops the car on the roadside. He says, “Sir, look at that open land. This is where once stood the factory of Union Carbide that exploded taking the lives of thousands of workers and other people.”

Godadhar and Kamalika get out of the car and gaze at the vast, abandoned area that lies barren and occupied only by weeds and bushes. They are taken over by some thoughts of sadness, as they awake to the memories of those horrible days of unimaginable disaster that gripped this city and the whole country. After a few minutes, they get back in the car and the journey continues. After a long while, Mohammad points at a stone structure at a distance from the road and says, “That’s the tropic of cancer marking the latitude line we’re crossing through now.”

“Yes indeed, we see the landmark alright,” says Godadhar, “the rest is imagination.” After some time, they arrive at Sanchi.

Sanchi Stupa

Sanchi is renowned for stupas, monasteries, temples and pillars and it is also one of the world’s famous places of pilgrimage for the Buddhists. Situated at a distance of about 46 km from Bhopal, this historic site lies in an upland plateau, west of the river Betwa and about 8 km southwest of the city of Vidisha. A group of monuments stands on this flat-topped hill that rises some 90 m above the surrounding land. This site was designated as a UNESCO World Heritage site in 1989.

Of all the monuments in Sanchi, there is one that is most noteworthy and that is what is known as the Great Stupa. It was discovered in 1818 by the British General Henry Taylor who also documented his findings. The Stupa was restored in 1919 under the supervision of Sir John Marshall, Director General of the Indian Archaeological Survey of the time.

Godadhar and Kamalika walk up the hill and stand in delightful surprise in front of the Great Stupa. It is a huge, magnificent hemispherical dome, called *anda*, standing on a base and surmounted by a balustrade. Buddhists believe a stupa represents the Buddha, the path to Enlightenment. The dome shape represents the Buddha seated in meditation when he achieved Enlightenment and Knowledge of the Four Noble Truths – (1) Life is suffering, (2) Desire is the cause of suffering, (3) Cause of desire must be overcome and (4) Nirvana meaning end of suffering. Mauryan Emperor Ashoka, who was the first King to embrace Buddhism, built thousands of stupas and divided the Buddha's ashes among them all.

The Great Stupa of Sanchi, the principal structure on the hill, was originally built by Ashoka in the third century and later renovated and enlarged by others. It measures 36.5 m in diameter and 16.4 m in height. There is a central pillar, called *Yashti*, which symbolizes the cosmic axis. A triple-umbrella structure that is supported on this pillar represents the three Gospels of Buddhism – The Buddha (*Buddham Sharanam Gachchhami*), Dharma (*Dharmam Sharanam Gachchhami*) and Sangha or Community (*Sangham Sharanam Gachchhami*). The entire superstructure is enclosed by a low wall which has four *Toranas* (gateways) at the four cardinal points. Each *Torana* is a pinnacle of achievement in sculpturing. The carvings on it depict the events of the Buddha's life and *Jataka* stories (the Buddha's previous life). The Toranas guide the practitioner in the right direction to Enlightenment that is the understanding of the Four Noble Truths. It is believed that Ashoka chose Sanchi for the Stupa because it was the place of birth of his wife Devi who was the daughter of a merchant of Vidisha, a nearby city. Sanchi was also the place of his wedding.

The Great Stupa at Sanchi

Godadhar and Kamalika take a round around the Great Stupa. On the way, they notice a young man who, sitting under a tree, is deeply absorbed in a book. Godadhar watches him with curiosity; he is attentively reading a book in a secluded place, sitting under a tree. The young man sensing someone approaching looks up at the senior couple and rises.

"Namaste, do you need any help, Sir?" He asks modestly.

"No, no, thank you. I trust I'm not disturbing you," responds Godadhar.

"No Sir, not at all."

"I'm only curious about your deep devotion to the book. What do you do by the way?"

“Well, I’m Ashoke Tiwari,” he replies with a smile. “I’m a mechanical engineer by profession, a football coach by hobby and a researcher on Buddhism by passion.”

“Very interesting, Mr. Tiwari,” exclaims Godadhar with an open-hearted laugh. “By the way, do you know, Mr. Tiwari, what’s there inside the Stupa?”

“I only know that there are the Buddha’s ashes and some other relics. There’re also some terracotta bricks made in Ashoka’s period about 300 BC; but tourists aren’t allowed to visit.”

“You seem to have a good knowledge in Buddhism. Can you throw some light about the karmic benefits of building a stupa?” Kamalika asks.

“Yes, Karma is an important principle in Hinduism as well as Buddhism. Karma is related to actions and their ethical consequences which may affect the next existence or re-birth. A practitioner of Buddhism builds a stupa to avoid re-birth.”

There comes another couple; they approach gazing at Godadhar with a broad smile. Godadhar looks at them with a smile of surprise and says, “Aren’t you Mr. Madhav Wankar who we met in the pre-boarding hall at Delhi airport?”

“Yes, yes, I am and here’s my wife Medha. I’m glad you’ve remembered us.”

“So nice to see you again!”

“Sure it is. I’ve been keenly listening to your conversation from a distance. Very interesting!”

“Mr. Wankar, please meet Mr. Tiwari, a knowledgeable man of Buddhism.”

“Glad to meet you, Mr. Tiwari. As you know a lot about Buddhism, I guess you’ll be able to tell me if there’re ashes of the Buddha in every stupa.”

“That’s hard to say, but according to the *Mahaparinirvana Sutras*, the Buddha gave specific instructions regarding the method of preserving his remains. His ashes were to be buried in a stupa at the crossing of the four mythical roads.”

“Is there anything else nearby worth visiting?” Godadhar asks changing the subject.

“Yes, about 13 km from here there’re a group of rock-cut caves, known as Udaipur caves, carved into a sandstone hill. An inscription in one of these caves states it was built during the reign of Chandragupta II, thus dating these caves to the fourth century AD. If you’ve time, you may go see them. You may find them interesting.”

“Thank you Mr. Tiwari, you’re a fine gentleman with a lot of knowledge about Buddhism. And thank you Mr. and Mrs. Wankar, who knows we may meet again.”

“Sure we may, somewhere someday.”

Stupa 2: Ashoka built eight stupas, but only three of them survived including the Great Stupa. Stupa 2 is also surrounded by a stone balustrade. The decoration on the surrounding wall, though simple in design, is attractive nonetheless. Unlike the Great Stupa, this Stupa has no *Toranas*.

Stupa 3: Third Stupa stands to the northeast of the Great Stupa. It has only one *Torana* and is believed to have been constructed immediately after the Great Stupa. Smaller in size but similar in design, Stupa 3 is crowned with an umbrella of polished stone.

Ashoka Pillar: Emperor Ashoka built pillars in many places of India to commemorate Buddhism, Sanchi being one important place among them. Here, there are a number of pillars scattered around in this site. Of these, the one close to the southern *Torana* of the Great Stupa may be regarded as one of the finest examples of Ashoka Pillars. Like most Ashoka Pillars, this one too shows amazing structuring balance. It consists of a column intricately carved and crowned by four lions standing majestically back to back. It is regrettable that the Pillar is partially damaged; only the column stands, the crown being preserved in the local museum. This crown with the four lions has been adopted as the National Emblem of India. It is familiar to every Indian, as this symbol appears on all coins and currencies. This Pillar is a significant landmark and an important tourists' attraction in Sanchi. One exclusive quality of this Pillar is its exquisite polish that still makes it shine when sunrays fall on it. Godadhar and Kamalika leave the place and walk down the hill to the parking lot. Kamalika shows interest in the Udaigiri caves.

"Should we go to visit those caves, only 13 km?" She asks.

"I guess not. Let's get back to Bhopal and see a few places in the city instead."

"If I'm not mistaken, there're other places by the same name, Udaigiri."

"Yes indeed, there are. There's Udaigiri at Rajgir in Bihar and also there are Udaigiri and Khandagiri caves in Orissa, which we visited a few years ago." They get in the car and proceed toward Bhopal.

Taj Mahal Palace

Mohammad parks the car in the front yard of a monumental building. "This is the Taj Mahal Palace," he says. Godadhar looks inquisitively at the building and ponders how this dilapidated building could be called a palace and could be a tourists' attraction.

"It's so unimpressive, Mohammad; are you sure it's the Taj Mahal Palace?" He asks.
"Yes Sir, this is it," he assures.
"It's not worthy of being called a palace," remarks Kamalika.
"It has lost its glory days, Madam. Renovation is overdue. It is soon going to be converted to a hotel."
"I see. The entrance door is locked and I don't see any tourist here. Is there any other way to go in?"
"I think I can do something. Let me try."
Mohammad finds a private way to get in, but for him only. After a few minutes, he comes out through the main gate along with another gentleman. This gentleman does not encourage the tourists to visit the palace, as the royal artifacts are not well displayed nor are they well maintained. The palace was once one of the largest palaces of the world. After the partition of India in 1947, Hamidullah Khan, the Nawab of Bhopal, gave shelter to many refugees in this palace. During the period of stay of these refugees, the palace got damaged. Later, some royal family members also lived in this palace. Many parts of the palace complex collapsed gradually.

Godadhar gives another glance at the run-down monument. The glamorous beauty of the old lady is still shining through the worn-out arches, lintels and gateways. The architecture that is still standing with its ancient fame was unquestionably one of the best in its prime days. "Maybe I'm the last tourist who can proudly say yes, I visited this wonderful palace," he ponders.

Taj-Ul-Masajid

Situated in the capital city of Bhopal, Taj-Ul-Masajid is a magnificent mosque of the nineteenth century. "Taj-Ul-Masajid" literally means "The Crown of Mosques". It may be its name's worth as it is claimed to be one of the largest mosques of India. It is also one of the most important mosques for the Muslims in India.

Taj-Ul-Masajid

The construction of this mosque began during the reign of the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar under the patronage of Shah Jahan Begum (1868 – 1901) of Bhopal. After her death, her daughter Sultan Jahan Begum continued with the construction. But the construction halted due to lack of resources to be finally completed by 1985.

Godadhar and Kamalika enter the huge courtyard of the mosque and get highly impressed by its beautiful pink façade and its cleanliness. The courtyard has a large tank in the center with an open-duct drainage surrounding it. The devotees take water from the tank and clean themselves in the duct.

Two eighteen-storey octagonal minarets with marble domes stand tall on two corners of the façade which is double-storeyed with four archways and nine cusped openings that lead into the main prayer hall. The hall has massive pillars highly patterned with intricate designs, which support twenty seven inter-arched ceilings. Taj-Ul-Masajid is not only a religious center; it is also a center of attraction for the tourists.

Moti Masjid

Situated in the heart of the city, Moti Masjid is a famous landmark of Bhopal. Built in 1860 by Sikander Jahan Begum, this mosque is an example of her emancipated ideas. Her revolutionary ideas brought about many architectural developments and construction of roads and monuments. The architecture of Moti Masjid is quite impressive; it resembles that of the famous Juma Masjid of Delhi. The mosque building is built with dark-red bricks with a marble façade, while the main prayer hall is built with bright white marble that shimmers like pearl. Moti Masjid has thus acquired the attribute of Pearl Mosque. Two red minarets with golden-spiked cupolas stand majestically on either side of the mosque.

Shaukat Mahal

Situated in the old city area of Bhopal, Shaukat Mahal was built by Qudsia Begum in 1830. Its architectural style is a blend of Gothic and Islamic styles, which makes it a novelty among the royal monuments in Bhopal. This Mahal is adorned with triangular-shaped arches and intrinsic floral patterns on its outer walls. Adjacent to Shaukat Mahal is another edifice called Sadar Manzil which was built by Shah Jahan Begum in 1898. This building, Sadar Manzil, now houses the Municipal Corporation of Bhopal.

Gauhar Mahal

Built in 1820 on the bank of the Upper Lake, this edifice has an elegant blend of Hindu and Mughal architecture. It is unfortunate that this heritage monument is in dilapidated condition. It has been decided that this Palace will be converted to a Museum.

Upper and Lower Lakes

These are two beautiful lakes that have accorded Bhopal the accolade of the “City of Lakes”. The Upper Lake is a vast expanse of water that reflects the city scape and is a major place for cultural and religious festivals. It was constructed by Raja Bhoj during his reign as the King of Malwa (1010 – 1055). It has a maximum length of 31.5 km and a maximum width of 5 km. A huge standing statue of Raja Bhoj has been erected in one corner of the Lake and lately since March 2011, the Upper Lake has been renamed as Bhojtaal after Raja Bhoj.

There is an interesting legend behind the construction of the Upper Lake. The local people believe that King Bhoj once suffered from some incurable skin disease. He called upon all the doctors of his kingdom, but they all failed. At last, he was advised by a saint to construct a tank where 365 tributaries would make a confluence and the King would then take a dip in that confluence. The King followed the advice and got cured. Thus the great lake has come to existence.

Bhojtaal is a popular tourist attraction. There are facilities for boat ride, kayaking, canoeing, rafting, water skiing etc. The Upper Lake is truly a location of entertainment. The Lower Lake is a smaller lake separated from the Upper Lake by a bridge. The two lakes together form a huge body of water known as the Bhoj Wetland. The Lower Lake was constructed by Nawab Hayat Mahammad Khan.

There are a few more attractive places in the city of Bhopal like Bharat Bhawan, Jama Masjid, Van Vihar National Park and the State Archaeological Museum. But the day has come to its end. And the Sun is about to set. So Godadhar instructs Mohammad to drive by the lakes so that they can watch the wonderful sunset by the lake on their way back.

The following day, the program is to visit the pre-historic site of Bhimbetka and the famous Shiv Temple at Bhojpur that falls on the way. But the day will begin with the visit of the Lakshmi Narayan Temple.

Lakshmi Narayan Temple

The Temple is visible from a distance. It shines as a bright golden yellow monument in the morning sun.

“Oh it feels so good, so peaceful and so spiritual here!” Godadhar exclaims as he enters the temple garden.

“Strange! You’re sensing spirituality even before entering the Temple,” says Kamalika. “No doubt this place has magic.”

Sure it is magical here. Lakshmi Narayan Temple, also known as the Birla Temple, is a beautiful Temple standing serenely amidst a large well-manicured, picturesque landscape. Calmness abounds around the Temple, which brings peace to the mind and uplifts the soul. This Temple is located to the south of the Lower Lake of Bhopal. It is another beauty spot of beautiful Bhopal. The Sanctum is spacious, impeccably clean and has a majestic architecture with marble everywhere. It houses Lakshmi Narayan in the center flanked by Lord Shiva to its left and Jagatdhatri to its right. Adjacent to the Temple, is a museum called Birla Museum that exhibits a large collection of sculptures from various districts of Madhya Pradesh.

While coming out of the Museum, Godadhar and Kamalika are caught up with a big surprise; they find themselves standing face to face with Mr. and Mrs. Wankar who they met in Delhi airport and in Sanchi as well.

"Here we meet again for the third time in as many days," says Godadhar while shaking hands with Mr. Wankar.

"Very strange indeed! Maybe there's a Canadian connection."

"And what's that?"

"We visited Canada recently, from Toronto to Vancouver passing through Regina, Calgary and Edmonton and Banff of course."

"I hope we meet the next time in Ottawa."

"Or in Pune where we live. Anyway, where're you heading now?"

"Bhimbetka and you?"

"To Jabalpur and Amarkantak. Well, see you again and bye for now."

Bhojpur Shiva Temple

The next destination is the famous Shiva Temple situated at Bhojpur. It takes only half an hour or less to cover a distance of roughly 25 km from Bhopal. Mohammad parks the car in an unpaved ground by the roadside. Across the road, a few shops are seen busy with their customers. The crowd is relatively light as there are not too many tourists. The shop owners and the young hawkers are trying hard to sell their stuff. A huge sign board of the Archaeological Survey of India stands on the left of the entrance to the Temple ground.

The Shivalingam of Bhojpur Temple

Godadhar and Kamalika enter the Temple ground and walk on a concrete path toward the shrine. On reaching the Temple, they stand awe-struck with the full glimpse of the imposing structure that remained partially eclipsed from afar. They are stunned by the awesomeness of the Lingam surrounded by a stone structure, although incomplete.

The Temple is dedicated to Lord Shiva. The incomplete Lingam appears gigantic standing 7.5 feet (2.3 m) tall. The Bhojpur Shiva Temple or the Bhojeshwar Temple as it is also called is believed to have been built by King Bhoja who also founded the city of Bhojpur. He was an able administrator and a great warrior. Archaeological studies reveal that the Temple was built in the eleventh century AD. This fact is also supported by the finding that a nearby Jain Temple was built in 1035 AD. Such huge structures could only be built by powerful kings. There are inscriptions in the Jain Temple bearing this date. This Temple, also unfinished, has a 20 feet (6 m) tall statue of the Jain saint Rishavanatha (Adinath).

The Shiva Temple has been built on a raised platform, 115 ft. (34.8 m) wide and 13 feet (4 m) high. The Lingam stands on a raised square-shaped platform. The walls are adorned with beautiful sculptures of Apsaras engraved on them. The reasons for leaving the construction unfinished are unknown; but there are drawings of plans of construction on a few rocks in the surrounding area, which may hold some clue. The locals strongly believe that Raja Bhoj boasted to complete the construction of the Temple in one day. As he couldn't do it, he left it unfinished. Others speculate that the construction was abandoned because of natural calamities that might have occurred at the time or due to lack of resources.

Godadhar and Kamalika come back to the car and Mohammad drives toward the next destination.

Maheshwar and Omkareshwar

Dr. Subhash C. Biswas

Maheshwar is a quaint city on the northern bank of the river Narmada. It may be true that the origin of the name Maheshwar is not precisely known. But it is true that most scholars, after consulting various Puranas and the epics like the Rigveda, the Ramayana and the Mahabharata, have come to the conclusion that Maheshwar was anciently known as Mahishmati. A famous city of Vedic and puranic

reputation, Mahishmati, according to some scholars, was named after King Mahishmat, a seventh descendant of Yadu. The great grandson of Yadu was Haihaya whose descendants were called the Haihayas. One of the Haihayas, Kartavirya Arjuna, son of Kritavirya, was a legendary king of the Haihayan kingdom. His valour and might earned him the epithet *Sahasrabahu* or the thousand-armed king. There are many anecdotes about his extraordinary or even supernatural strength, which make him appear like a mythical personage. The ruins at Mandol Kho are still believed to be those of his capital Mahishmati. According to the ancient texts, he seems to be a contemporary of the Avatar Parashurama and the demon king Ravana.

Godadhar and Kamalika are received by a gentleman in front of the hotel. Mohammad says his name is Sachin and he has been pre-arranged by him as a guide. “Mr. Sachin,” asks Godadhar, “before going on with the tour, we badly need a good cup of coffee. Is there a good coffee shop nearby?”

“Yes Sir, you’re just standing beside one across the street. You’ll get the best coffee of Maheshwar there. Most foreigners go there for coffee.”

“Ok good, let’s go there.”

“Alright Sir, take your time. I’ll wait here for you. After you come back, I’ll take you to the fort, Ahilyabai Fort.”

Ahilyabai Fort

The city of Maheshwar languished in obscurity for many centuries until it was revived by the great queen Ahilyabai Holkar in the late eighteenth century. Ahilyabai was born on 31 May 1725 in the village of Chaundi of today’s Ahmadnagar of Maharashtra. It is noteworthy that she was not born into a royal family. In those days, women were not allowed to go to school. But her father, Mankoji Rao Shinde, taught her some basic education.

Ahilyabai Fort from the River

Her entrance into the royal class was kind of accidental. Malhar Rao Holkar was a nobleman of the Maratha Empire. He was a commander in the service of Peshwa Balaji Baji Rao and ruled in the Malwa State. Legend has it that once on his way to Pune; he made a halt in the village of Chaundi where he noticed a little girl engaged in religious services in a local Shiva temple. That was Ahilyabai, only eight

years old. Malhar Rao liked the girl and brought her to his palace in Indore. That is when her life changed forever with a big leap. She got married to his son Khande Rao, the prince of Indore. But the happy married life did not last long. Only about a decade later, Khande Rao lost his life in the battle of Khumbher in 1754. A totally broken down Ahilyabai readied herself to sacrifice her life on the pyre of her husband. But her father-in-law Malhar Rao, although terribly shattered by the sad news, persuaded her not to go for this deadly ritual and instead take the responsibility of the kingdom.

As a ruler, Ahilyabai lived a very simple life and shunned all royal luxuries. Yet she proved to be a great warrior and a powerful queen. She shifted her capital to Maheshwar and raised the fame of the city to its ancient glory. Her fame as a queen rose to an extraordinary height. She never hesitated to take the strongest possible measure against injustice and firmly stand by all the needs of her people. Her accomplishments are numerous; her charitable works spreading all over India loudly speak for her fathomless generosity and dedication to the people. She built countless temples, dharmashalas, ghats, and donated funds for many charitable purposes. Kashi Vishwanath Temple in Varanasi, Ayodhya temples, Somnath Temple in Gujarat, Amarkantak temples in Madhya Pradesh are only a few of too many to name. She was a human incarnate of kindness and charity. In her personal life, she got terrible shocks and grief, yet she remained undaunted in her pursuits and devotion to Lord Shiva.

Ahilyabai Holkar ruled from Maheshwar for thirty-one years from 1765 to 1796. The fort she built reflects the glamorous history that this great queen has left behind. It stands in humble beauty for the posterity to behold and hail with quiet gratitude.

The majestic Fort sits on a cliff high above the Narmada River. The Palace inside the Fort complex has been converted into a museum that exhibits the heirloom and relics of the Holkar dynasty. A life-size statue of Ahilyabai gracefully stands in front the Fort. The major part of the Fort has been turned into a luxury hotel. Looking at the Fort from outside, one can see an open room with three life-size statues of (1) a Horse symbolizing courage and power, (2) an Elephant with a mahout representing might and monarchy and (3) a Bull, Shiva's vehicle Nandi, representing divinity and righteousness. The Queen always followed these three fundamental values to rule her country.

The Palace, called Rajwada, was her place of residence as well as her royal court. It is a simple but elegant building adorned with admirable wood carvings. The Queen used to hold her court in an open corridor where she sat with a Shiva Lingam in her hand to attend to her people and provide justice. There was no throne so to say but a simple cotton mattress surrounded by a few wooden pillars and portraits of the noble Holkars. The court reflects remarkable simplicity. Her palanquin is on display in the premise, which is still taken out every Monday in a procession.

Ahilyabai's Puja Room

The Queen was a great devotee of Lord Shiva. She had a private room solely dedicated to her every day puja. This room has a treasure of valuable idols made of gold and silver. There is a huge banyan tree about three hundred fifty years old, which is still standing strong beside this puja room like a protective umbrella. It is very strange to note that unlike other banyan trees this tree does not have any root shooting out of its branches. Queen Ahilyabai followed a rigid procedure for her daily puja ritual. Every day before sunrise, she took bath in Narmada and collected a Shiva Lingam (a special stone resembling the Lingam) from the river coast and established it as her god for worshipping.

She employed eleven Brahmins to do *Abhishek* of God Shiva. Every day these Brahmins carefully crafted one hundred fifty thousand (150,000) miniature Shiva Lingams out of clay collected from

Narmada. The Queen performed puja and *Abhishek* of these lingams for the benefit and wellbeing of her subjects. This ritual is still performed but with less number of lingams, about fifteen hundred of them. Every morning these lingams are crafted and arranged on trays specially designed for this purpose. After the puja and Abhishek, these lingams are immersed in the water of Narmada. This immersion job is performed by a lady who is specially assigned for it.

After the Fort complex, the guide Sachin leads his visitors to the Ghat on the bank of Narmada. It is within walking distance, but Mohammad insists to go by car as the roads may not be easy for walking.

Narmada, Temples and the Ghat

There are two temples on the river bank – **Ahileshwar** and **Akhileshwar** (also called **Vithoji**). These temples are actually chhattris (cenotaphs). **Ahileshwar Shivalaya** is a beautiful temple that is made of stone with blended style of architecture. This Chhattri is designed like a temple that has a Sanctum housing a Shiva Lingam along with a statue of Ahilyabai. Two tall Deepastambhas (lamp posts) stand on either side of the temple. There are two other small temples in the complex dedicated to Lord Rama and Hanuman. Vithoji's Chhattri is another beautiful temple, small in size but very elegant and attractive. It stands in front of Ahileshwar Shivalaya. This temple is a memorial of Vithoji Rao, son of Yashwant Rao Holkar who ruled Indore from 1806 to 1811. This Chhattri is adorned with carvings of elephants on its plinth and figures of musicians and dancers on the walls. The entire structure is crowned with a bulbous dome.

Ahilyabai Ghat with Ahileshwar and Vithoji's Temples

The **Ahilyabai Ghat** on the bank of the river Narmada is a wonderful sight that no tourist should miss. Built by Rani Ahilyabai, this Ghat is believed to be the largest and the best in India. And a boat ride on the river Narmada is an experience of a life time; the tourist gets a golden opportunity to enjoy the complete beauty of Maheshwar. Narmada is a wonder river. From its source at the Amarkantak Plateau where the Vindhya and Satpura mountain ranges meet, Narmada flows westward over a length of 1312 km before entering the Gulf of Khambhat through an estuary, 21 km wide, and then it drains into the Arabian Sea, 30 km west of Bharuch city of Gujarat. It is one of the sacred rivers of India, so sacred that even the holy river Ganges, when it gets overburdened with the sins of all that washed their sins in it, comes in the form of a black cow to take a dip in the holy water of Narmada to cleanse itself of its load of sin. Narmada has been mentioned in most of the ancient texts of India including the Ramayana, the Mahabharata and the Puranas, where one can find many fables about it. Many devoted Hindus and

saints go for the formidable task of Narmada *Parikrama* (circumambulation). They walk on foot from the source to the sea along the river and back along its other bank. This spiritual journey takes more than three years. The pilgrims visit all the temples on their way and spend days in the ashrams of many gurus.

Standing on the steps of the Ghat and gazing at the river, Godadhar and Kamalika wonder about a boat ride. Godadhar calls for the guide. “Sachin, we want to take a boat ride. Can you arrange, please?”

“Sir, it has been already pre-arranged. There’s your boat waiting for you. It’s a very good boat with an excellent crew, you’ll like it.”

“It’s really a beautiful boat, lovely,” says Godadhar. “And it feels heavenly boating on the water of Narmada.”

“It’s true, really true,” responds Kamalika. “It has been a dream of mine since I read that book on Narmada.”
“Which book, Malika?”
“*Tapobhumi Narmada* by Shailendra Narayan Shastri.”
“Oh ya, that’s a very exhaustive book detailing his Narmada Parikrama. And you know there’s another one, very scholarly one, which deals mainly with the spiritual aspects of Narmada quoting from the Upanishads and other texts.”
“I know which one you mean. That’s *Shashta Khande Narmada* (Narmada in Six Volumes) by Nrisingha Prasad Bhaduri.”
“Yes, that’s the one. So I guess everything about Narmada is fresh in your mind, right?”
”You may say so.”
“I know Narmada has meanings that are realistic as well as spiritual. Can you throw some light on it?”
“Well, the word Narmada derives from the root word <*narman*> that means playfulness, enjoyment, or joyful travel. So whoever/whatever provides <*narman*> is *narmada*, that’s all.”
“I don’t think that’s all. There must be some spiritual overtone.”
“Yes, there is. The author talks about that too. According to some *Upanishad*, everyone is born out of joy and everyone thrives in joy, and at the end everyone gets merged with the eternal joy. Whoever makes one feel and understand this endless joy is Narmada.”
“Oh that’s great! It’s very deeply spiritual. There’s another name of Narmada and that’s *Reva*. It’s mentioned in the *Puranas*. It comes from the root word <*Rev*> meaning loud sound. You know, in its long course Narmada goes through mountainous terrain at a very high speed. It rises and then falls with huge roaring sound. That’s where the name originates.
“There’s yet another name in the Mahabharata and that’s <*Samanga*>.”
“There’re many puranic stories about the origin of Narmada, right?”
“Yes, one story says when Lord Shiva was perspiring because of a long meditation on the Amarkantak peak, his sweat flew like a river and that’s Narmada.”
“What a sweat! I guess he’s still sweating continuously sitting on the peak to keep up the flow.”
“I don’t know, but there’s another story where it says Narmada was born as a beautiful girl out of the blue throat of Lord Shiva. She was blessed by Him to become a river.”
“That’s more acceptable.”

Raj Rajeshwar Temple

“There’s yet another which I find very interesting. You know there was once a King Maikal who ruled in the Amarkantak region. His daughter, princess Narmada, was very pretty. One day she met a handsome young man named Shonebhadra who was the prince of a neighbouring state. They fell in love and proposed to marry each other with firm commitment. Shonebhadra went back home promising to come back soon with his father, the King. But he got engaged with a war that broke out with another state and so he failed to come back to Narmada as promised. A long time passed; so Narmada’s father got impatient for the marriage of her daughter. He lost faith in the promise of Shonebhadra and got Narmada married to another prince. But ironically, the day after the marriage, Shonebhadra came back with his people for marriage. When he got the bad news, he became angry and cursed Narmada to become a river and flow eternally. Narmada too became unhappy with the unreasonable anger of Shonebhadra and cursed him to be a river too. Since then both are flowing as river Narmada and river Shone. As we all know, both these rivers are real rivers originating at Amarkantak.”

“Very interesting, I like it.”

“Hey, we’re only talking! Look at the incredible beauty of Narmada and the Ahilyabai Ghat.”

“That’s true. Water is calm, weather is excellent and the beauty, oh my God! It’s fantastic.”

“Sir, Madam, please look in front of you,” says the boatman.

“That’s a little temple,” exclaims Kamalika.

“Oh how pretty! A little temple standing like a watch tower in the middle of the river,” says Godadhar. “What temple is this?”

“This is Baneshwar temple,” says the boatman.

Baneshwar Temple is built on a small island in the middle of Narmada River. It is a very old temple that was built sometime in the ninth or tenth century. It is named after an Asur called Banasur who performed hard penance to please Lord Shiva.

After the boat ride, the guide shows the way to another temple site, **the Raj Rajeshwar Sahasrabahu Temple.** It is only a short distance away. The visitors have to go on foot from here. Guide Sachin bids good-bye saying that a local guide will be available at the temple site. This Temple is dedicated to Lord Shiva. Its original date of construction is buried in mysterious antiquity. People believe it was first established in the *Treta Yuga*, but it is not known by whom. The king of this land was the mighty warrior Kartavirya Arjuna. He was that mighty king who killed the legendary, powerful Rishi Jamadagni, father

of Parashurama, for his *Kamdhenu*. He was the king of kings, the Raj Rajeshwar. The legend behind this Temple comes from an anecdote that involves another powerful king, Ravana.

The King Kartavirya once had a vision of Narmada as a beautiful princess and he proposed to marry her. Narmada offered a challenge for the King. If the King could stop her flow, she would marry him. Raj Rajeshwar agreed, but he realized it would be impossible. So he decided to pray to Lord Shiva to grant him enough strength to meet the challenge. He worshipped Shiva at this spot where the temple is and got a boon from Him, which gave him the required strength. Empowered by this boon, the King tried to stop the flow of Narmada. But Narmada could not be stopped; instead she branched out in eleven separate branches. As a result, Ravana, another follower of Shiva, fell into an unfortunate situation. He was worshipping his God in a secluded place that suddenly came in the way of one of those eleven branches of Narmada and got washed away. His worship got disrupted, which terribly enraged him. When he came to know who was behind this misfortune, he confronted Raj Rajeshwar; a dreadful fight ensued between the two irascible superpowers. The two mighty kings fought, but at the end it turned out that Ravana was no match for Kartavirya. Ravana thus got imprisoned and humiliated. He got punished and his punishment was to stand eternally in the temple holding eleven lamps that would remain lighted forever. He held ten lamps in his hands and one on his main head. Ravana's grandfather, Pulastya, accosted Kartavirya requesting Ravana's release as he was also a Shiva's devotee. The King complied and released Ravana. But those eleven lamps have been kept alight till today with the help of pure ghee supplied by devotees. These continuously lit lamps are called *Akhand Pradeep* and they represent the eleven branches of Narmada.

This place is the last site in their itinerary. "Kartavirya Arjuna seems to be a historical figure as well as a puranic legend," comments Godadhar.

"Right indeed, so I get confused which one to believe."

"You're not the only one. Anyway, let's go to the shoe stand to get our shoes."

"Hey, where're my shoes?" exclaims Kamalika coming to the shoe place. "I can't find them, they're missing!"

"Maybe someone put them on by mistake," says the guide. "It happens sometimes."

"Now what should I do?"

"Madam, find a pair that fits you," the guide suggests. "People often do that in such cases."

"No, no, I hate to do that. That amounts to stealing. Is there a shoe store nearby?"

"Yes Madam, there's one, but you'll have to walk barefoot. Can you manage to do that?"

"I'll have to under the circumstances. Will you come with us to show the store?"

"No problem, let's go."

The shoe store is really not too far, but far enough to walk barefoot and that too on a dirty road. It is a very modest store on the roadside run by a cobbler who manufactures his merchandise. As this is the only shoe store in the area, Kamalika settles for it and buys the best pair she can find. As soon as they come out of the store, someone approaches them. "Madam, would you like to see some good Maheshwari sarees?" He asks.

"No, no, I don't need any saree. Thank you." Saying no seems to be a spontaneous response; she thinks back in her mind. Maheshwari sarees were initially designed and developed by Queen Ahilyabai

herself. These sarees have acquired a respectable reputation in the heart of women for a long time. These sarees have an emotional appeal in the mind of every Indian woman. Kamalika halts for a second and then says yes to the gentleman. Besides, she can now walk comfortably with the new slippers.

When they come out of the saree store, they find Mohammad waiting in front of the store. “How did you know we would be here, Mohammad?” Godadhar asks. “Do you have a sixth sense?” Mohammad smiles a little in response.

“Are we going back to the hotel now?”

“Yes madam, to hotel now and then tomorrow morning to Omkareshwar.”

Omkareshwar

Omkareshwar is a small island in the Narmada River about 65 km from Maheshwar. Coming close to the island, Mohammad asks, “Sir, there’re two ways to go to the island. First, you cross the river by the bridge on foot, as cars are not allowed there. And second, you can enjoy a boat ride to go to the island. Well, there’s a third option as well and that’s you go on foot and come back by boat or vice versa.”

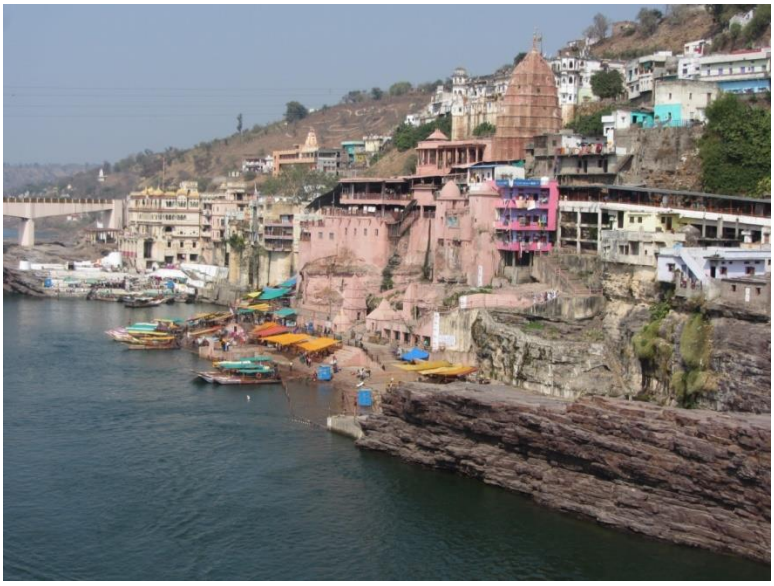

Omkareshwar Temple

“Well Mohammad, we choose the first option that is on foot both ways.”

“Ok Sir, I’ll park the car on the south bank. From there you’ll walk to the bridge and cross. A word of caution Sir, if you allow me.”

“Yes, tell me.”

“There’re no guides as such here, but there’re helpers who’ll guide you if you want. They call themselves Pundit. You’ve to be careful as they don’t have a fixed rate. Just looking at the visitor they quote a price of their choice, usually very high.”

“Ok Mohammad, thanks for warning me. I’ll see what I can do. I’m not good in bargaining though.”

Soon after they come out of the car, a gentleman, dressed in the costume of a Hindu priest, approaches them.

“Namaste, my name is Saurav, Pundit Saurav. I’ll be pleased to take you round the temples and explain everything and even conduct a special puja for you inside the main Temple.”

Special puja appeals to Kamalika, so she pleads for hiring the Pundit. Noticing Godadhar’s hesitation, Mr. Saurav highlights the difficulties involved in going without a guiding help. “The passage to the Sanctum is long, narrow and extremely crowded. People, especially the seniors, get badly pushed. Sir, I’ll take you straight to the Sanctum, no line-up, no pushing around, comfortable walk. You’ll be escorted smoothly to the Sanctum, very close to the main Priest and the Lingam. He’ll even bless you while you’ll see big crowd being pushed out soon after a momentary glimpse of the idol. You’ve my guaranty, Sir; if not satisfied, don’t pay. It’s that simple.”

“Ok Mr. Saurav, you may escort us.”

The Temple Omkareshwar is situated in the Omkareshwar Island. This island was anciently known as Mandhata or Shivpuri. The geographical shape of this island resembles the holy symbol Om of Hinduism, which makes this island a sacred place for the Hindus and hence the name Omkareshwar. *Omkar* is the other name of *Om Mantra* which is the main Mantra for worshipping the Supreme Brahman and the syllable pronounced before chanting any mantra. The Lord of Omkar is Omkareshwar and that is Lord Shiva. The island Omkareshwar is adorned with lofty hills and beautiful greenery. The river, the Temple and the cantilever bridge all together make an extraordinary sight to see.

The Omkareshwar Temple has a few legends behind it. According to one such legend from Shiv Purana, Narada the divine messenger once came down on earth to visit the Vindhya Mountain. The Mountain appeared in human form and very respectfully welcomed the sage with good refreshments and entertainment. Narada was highly satisfied, but played a trick on Vindhya. He said, “Hey Vindhya, you’re good; but Mount Sumeru is much superior to you as he is a favorite of Lord Shiva and he has been rewarded with the Lord’s constant presence there.” Vindhya felt somewhat inferior; so he decided to please Lord Shiva to gain his favour in order to be equal to or better than Mount Sumeru in every respect. He performed ardent penance praying to Lord Shiva. Eventually, Shiva was pleased and appeared before him and granted his desire. Since then Mount Vindhya became Shiva’s abode and He stays there forever in the Omkareshwar Temple.

Another legend from the Mahabharata explains why Omkareshwar is also called Mandhata. King Mandhata belonged to the Ikshwaku clan; he was a son of King Yuvashwa of Ayodhya. He worshipped Lord Shiva here in this island until the Lord manifested in the form of a Jyotirlingam. The King established a temple dedicated to Lord Shiva. The island thus came to be known as Mandhata Island and also as Shivpuri. There is yet another story that says Lord Shiva appeared here as Omkareshwar to subdue the Asuras during the violent war between devas and Asuras.

The infinite column of light of Lord Shiva was the main Jyotirlingam which He fragmented into twelve pieces and dropped them on the earth. Jyotirlinga shrines are the temples that were built on the spot where those pieces touched the earth. Lord Shiva appears there as a fiery column of light.

It is quite a bit of walk to reach the Temple from the parking lot. But the unease of walking completely disappears when one strolls on the bridge over the river Narmada. It is an awesome feeling that pleases the mind. Arriving at the island Mr. Saurav says, “There’s a *Parikrama Path*, I mean a path circling around the island, about seven kilometer long, with many ups and downs but also there’re several temples on the way, beautiful green scenery. Many pilgrims go for this holy *Parikrama*. Would you like to go?”

“Thanks Pundit-ji, but no, we would like better to go straight to the Temple.”

“I thought so, but it’s my duty to mention it to you. So let’s proceed.”

The entrance of the Temple leads into the principal Mandap (front hall) that has about sixty huge pillars made of brown stone elaborately carved with curious friezes and figures. The Temple has five storeys each of which has a deity. The front Mandap is crowded with visitors and pilgrims. Many are seen as coming after taking a bath in the river; each of them is carrying a pot of water from Narmada along with some articles of worship. “Please stay close to me and follow me,” says Mr. Saurav. “It’s easy to get lost here.” He leads them along a special passage straight to the Sanctum Sanctorum. Kamalika and Godadhar stand with devotion just in front of the Jyotirlingam in close proximity. They feel overwhelmingly amazed being so near to the Lingam and the Priest. The Lingam is quite small in size like all other Jyotirlingams. The Priest asks for their *Gotra* (lineage relating to the Saint of their origin) and performs a short puja for them. They come back along the same passage to where Mr. Saurav has been waiting for them. “How did you like the darshan?” Mr. Saurav asks. “It was heavenly,” replies Godadhar. “You deserve our heartfelt thanks, Pundit-ji.”

“My pleasure, Sir. Now, there are a few more shrines in this Temple like Mahakaleshwar, Gupteshwar, Siddnath and Dhwajeshwar. But these shrines may not be worth the trouble unless you are seriously devoted to those deities.”

“No, we may keep those shrines for our next visit. Now what should be our next move?”

“As I promised, we can now do the special puja for you. Please follow me.”

“Where’re we going?” Kamalika gets slightly worried. She is always suspicious of anything unusual or too tempting.

“You’ve nothing to worry; it’s only a few steps from here. You’ll get an excellent view of Narmada from there. Please come, come, and follow me. Here, just here. Look there, all arrangements for the puja are ready.”

Godadhar is surprised seeing the arrangement. “See Malika, it’s an elaborate puja arrangement and amazingly, there’s a marvelous Lingam at the center.” But Kamalika’s face does not show any encouraging sign. She responds with a dubious feeling. “It’s true the arrangement is very ritualistic. But see, there’re more priests than we need sitting around the altar.” She turns to Mr. Saurav and asks, “Why do we need so many priests for a simple puja?”

“Madam, I’ve arranged for an elaborate puja. Five priests including me will chant the mantras in chorus. Your worshipping and prayer will be very forceful and effective. Please sit in these two places especially prepared for you.”

Kamalika says something in Bengali to Godadhar meaning it is a plan to demand more money. “Five priests! That’s crazy! Each one wants a piece of the pie, I guess.” Mr. Saurav breaks into laughter. “Madam, I perfectly understand Bengali. No, there’s no such plan,” he responds convincingly. “Let’s begin the puja.” The puja begins. The other priests conduct the puja following rigidly all the ritualistic procedures. It goes on in an impressive way for quite a while until the last moment of climax, when the main priest suggests them to make a *Sankalp* (uttering the prayer in mind with a commitment of offering). Actually, at this point the worshipper offers the *Dakshina* (fees for the priest). The priest starts bargaining asking for an exorbitant amount, which upsets Godadhar.

“Pundit-ji, as you said before, the amount of *Dakshina* is what my heart desires and what I can afford. I hate to bargain with my devotion. So, please stop this lowly bargaining game for god’s sake. My *Sankalp* will make you happy, I believe. Now please complete the puja.”

At the end of the puja, Mr. Saurav leads them back to the south bank walking all the way. “I’m sorry,” he apologizes, “this *Dakshina* matter is out of my control. It goes to a common fund. But as I told you, it covers the price of your special tickets. Anyway, let’s now visit two more temples in the south bank – Mamaleshwar and Vishnu Temple.”

It is believed that Omkareshwar and **Mamaleshwar** collectively make one Jyotirlinga and it is customary to visit Mamaleshwar after worshipping the Jyotirlinga of Omkareshwar. This temple is a protected ancient monument with admirable architecture and stone work. Here too there is a long queue, but Mr. Saurav with the help of another priest guides them along a separate passage up to the Sanctum Sanctorum where the priests are performing puja. Adjacent to Mamaleshwar, there is **Vishnu Temple**. Omkareshwar is known as Shivpuri, Mamaleshwar as Brahmapuri and Vishnu Temple as Vishnupuri. Both these last temples are very old temples. A few ancient statues are still standing in the front yard of these temples.

Omkareshwar is the southernmost place to visit in this program. Now the return journey commences to go back up north. The next halt is Indore, but on the way there is a program to stop at a Shanidev Temple. The Dakshina affair at the Omkareshwar Temple is still troubling Godadhar.

“You know Malika, Pundit Saurav was fairly good in his job to show us the temples, but I can’t accept the way they tried to twist us in order to extract more money by overwhelming us with the glamour of puja and the loud chanting of mantras.”

“Yes, you’re right. This is kind of blasphemy, deception for the sake of ludicrous gain of money. This shouldn’t happen in a holy place, but it often does.”

“I hate the nasty games that are played to exploit the mind of the devotees in the name of God. Everyone knows money cannot buy God’s blessings, yet people are led to believe otherwise.”

“Right, sadly indeed!”

“Money is important for the temples, but it should be collected in a decent way. If it’s done honestly, I’m sure money will be poured in, abundantly. There’re many temples in India, which get enormous amount of money only through donation.”

“Another point that bothers me is the obsession with water, flower and other puja stuff that make the precinct of the temples wet and dirty.”

“Right, that’s another problem.”

রাজস্থানের তীজ উৎসব

সুপর্ণা মজুমদার

কয়েক দিন ধরেই সিমাকোরির মধ্যে বেশ একটা চাপা খুশী খুশী ভাব। অমন যে গোমড়ামুখো নানীবাঈ, সেও যেন একটু ভালো মনে আছে। কৌতুহল চাপতে না পেরে কথায় কথায় কাজল একদিন সিমাকোরিকে জিগেসই করে ফেললো। তার একগাল হাসি।

-মাজী অব বারিস্ আওএগো তো ? মাহরো তীজ কো তেওহার হ্যয় না।

-উয় ক্যয়া হ্যয়?

সিমাকোরি অবাক হয়ে গালে হাত দেয়। ভাবখানা এমন যে এই পৃথিবীতে কি এমন কেউ আছে যে তীজের পরব কি তা জানে না? তারপর ভাবে, এরা বাঙালী - এদের সব পরব তেওহার নিশ্চয় আলাদা। তখন সে কাজলকে তীজের কথা খুলে বলতে থাকে।

রাজস্থান অঞ্চলে বৃষ্টি এক দুর্লভ বস্তু। বিধাতার এইরকমই বিচার। কোথাও ঝড় বৃষ্টি বন্যায় প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষের প্রাণ যায়, আর এই মরুভূমির দেশে, শুধু ধু ধু করছে বালি আর বালি। রুক্ষ সুক্ষ প্রকৃতি আকাশের পানে অসীম তৃষ্ণা নিয়ে একটু জলের আশায় চেয়ে আছে।

শ্রাবণ মাস পড়ার আগে থেকেই তোড়জোড় শুরু হয়ে যায় "তীজ" নামক তেওহারের। অবশ্য জয়পুর উদয়পুরের মতো বড় শহরে এলাহি ব্যপার, কিন্তু এই গন্ড গ্রামের লোকেরাও যথাসাধ্য আয়োজনে মেতে ওঠে।

শ্রাবণ মাসের তৃতীয়ায় শুরু - চলে হয়তো দুচার দিন ধরে। বেশীর ভাগ মানুষই এত গরীব যে তারা আবার চেয়ে থাকে, অবস্থাপন্ন গৃহস্থের মুখের দিকে। আসলে এই উৎসবটা হয় বিবাহিত মেয়েদের ঘিরে।

স্বামীর দীর্ঘায়ূ কামনায় নাকি?

না, সিমাকোরি অত শত জানেনা, তবে তার বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলবার ক্ষমতা দারুণ। বলে –

> – শিউজী মহারাজের প্রথম আওরত সতী মাঈ নিজের প্রাণ ত্যাগ দেওয়ার পরে উনি তো পাগলের মতো হয়ে গেলেন। সতী মাঈ একশ আট জন্ম পরে পার্বতী হয়ে পাহাড়ের রাজার ঘরে জন্মালেন। শিউজী মহারাজকে বিয়ে করার জন্যে জোর তপ শুরু করে দিলেন। অনেক দিন পরে শিউজী মহারাজ পার্বতীর দিকে চোখ খুলে দেখলেন আর তাকে বিয়ে করলেন।

এইসব গল্প পুরুষানুক্রমিক ভাবে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে হয়ে চলেছে মুখে মুখেই। বিবাহিতা মেয়েরা এইদিন সাজগোজ করে, উপোস করে থেকে পার্বতী মায়ের পুজো করে, তার পর মিষ্টি (ঘেওর, প্যাঁড়া, লাড্ডু) খেয়ে উপবাস ভাঙে। যারা খুবই গরীব তারা হয়তো আটার হালুয়া বানিয়ে খায়।

এই গ্রামে একটাই মন্দির। সবচেয়ে বড় মূর্তিটি রাম সীতার, তবে হিন্দু ধর্মে যত জন দেব দেবী আছেন, এই মন্দিরে সবারই ছোট বড় মূর্তি আছে।

গেল মাসে সোমনাথ যখন ওষুধ আনতে উদয়পুরে গেছিলেন, তখন কাজলের মামীমার সঙ্গে দেখা করে, মামীমার ভাইএর দোকান থেকে কাজলের জন্যে বাড়িতে পরার তিন চারখানা ছাপার শাড়ি এনে দিয়েছিল। কাজল তার থেকে একটা বের করে সিমাকোরিকে দিতে গেল। কিন্তু সিমাকোরি তা কিছুতেই নেবেনা। শেষে বললো এত পাতলা শাড়ি দুদিনেই ছিঁড়ে যাবে, রঙ জ্বলে যাবে। তার চেয়ে মাজী যদি ওকে অল্প কিছু টাকা দেন তাহলে ও একটা ঘাগরা বানাতে দেয়। এখানে বেশীর ভাগ লোকই খুব গরীব, কিন্তু কাজল এখনও অব্দি কাউকে ভিক্ষে করতে দেখেনি, বখশিস দাও বলে ঝুলোঝুলি করতেও দেখেনি। অথচ দারিদ্রের অহঙ্কারও নেই।

খেটে খাওয়া পরিশ্রমী মেয়েরা এক রকমের মোটা কালো কাপড়ের ঘাগরা পরে। তাতে কাঁচ বসানো লাল হলুদ সূতোর কাজ। কালো রঙ কারণ নোংরা হলে বোঝা যাবেনা। আর যে দেশে জলের এত অভাব, সে দেশে কাচাকুচির বালাই তেমন নেই বললেই চলে।

এদের ছাতে ময়ূর আসে। কাজল দেখতে পেলে মুঠো ভর্তি গম নিয়ে ছড়িয়ে দেয়। ময়ূর ময়ূরী খুঁটে খুঁটে খায়। বেশ লাগে দেখতে। এত সুন্দর পাখি। তবে তার বিরাট আকৃতির জন্যে পাখি না বলে প্রাণী বলাই ভালো। ময়ূর যেমন সুন্দর, ময়ূরী আবার তেমন নীরেস। ওরা খুব বেশী উঁচু উড়তে পারেনা। পেছনের জমি থেকে কোন রকমে দোতলার ছাদ অব্দি। কিংবা এক গাছের ডাল থেকে আরেক গাছ অব্দি।

কাজল খাবার দেয় বলে না কি, কাজলকে এরা ভয় পায়না। একদিন একমুঠো গম হাতে নিয়ে কাজল ছাতের পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়েছিল, বড় ময়ূরটা কোথা থেকে ঝটপট আওয়াজ করে উড়ে এসে ওর হাত থেকে গম খেয়ে গেল। এর পরের ঘটনাটা অবশ্য খুব প্রীতিজনক হলোনা। সিমাকোরির সবচেয়ে ছোট ছেলেটি, যার নাম লালচনিয়া, সে গুটিগুটি সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেই ছাদে ময়ূর দেখতে এসেছে– অমনি ময়ূরটা কর্কশ ক্যাঁ ক্যাঁ আওয়াজ করে এমন জোরে ছুটে ওকে তাড়া করে গেল যে, লালচনিয়া ভয়ে একেবারে ভ্যাঁ করে কেঁদে একদৌড়ে নীচে। এত সুন্দর পাখির এমন বিশ্রী গলার স্বর! আর কোকিল কালো বলে বুঝি সৃষ্টি কর্তা তাকে অমন মিঠে আওয়াজ দিয়েছেন!

একদিন ছাদ থেকে পেছনের জমিতে কাজল আর সোমনাথ, একটি ময়ূরীর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যে দুটো ময়ূরকে পেখম মেলে নাচতে দেখলো। সেদিন কাজলের কি আনন্দ! সোমনাথ বলে –

– দেখেছ কাজল, ময়ূরীটা কি অহঙ্কারী! দুটো বেচারা কৃপাপ্রার্থী কত খেটে মরছে, আর মহিলাটি ফিরেও দেখছে না। নিজের মনে জমি থেকে খুঁটে খুঁটে খাবার খেয়েই চলেছে।
– কেন পাত্তা দেবে? ও তো ভালোভাবেই জানে ওদের মতলবটা কি!

সে এক অপূর্ব দৃশ্য! আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, তার মধ্যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নেচে চলেছে। কাজলের গায়ে কাঁটা দেয়, কলকাতায় থাকলে কি সে কোনদিন এই শিহরণ অনুভব করতে পারতো? অবশ্য কিছুক্ষণ পরেই একটা ময়ূর আরেকটা ময়ূরকে এমন তাড়া করে গেল যে অন্যটা চাচা আপন প্রাণ বাঁচা বলে দৌড়। কাজল এই ছন্দপতনে যেন একটা মোহনিদ্রা থেকে জেগে উঠে বলল –

- ইশ্!
- ইশ্ আবার কি! ওর জায়গায় আমি হলে অন্য কাউকে ময়দানে ঢুকতেই দিতাম না। ওটা নেহাৎ ভালো মানুষ বলে rival টা কে এতক্ষণ বরদাস্ত করেছে।
- আচ্ছা এবার নীচে চল, মেঘ ডাকছে, মনে হয় জোর বৃষ্টি আসছে।
- চল, তবে ম্যাডাম, যত গর্জায় তত বর্ষায় না।

অবশেষে একদিন সেই বহু প্রতীক্ষিত বৃষ্টি এলো রাতের দিকে। রাতে এমনিতেই একটু তাপমাত্রা কমে যায় – বৃষ্টি পড়াতে হাল্কা শীত করতে লাগলো। তবে মুষল ধারে বৃষ্টি শুরু হলো পরদিন দুপুর দুটো নাগাদ। বাড়ির ছাদের চারদিক দিয়ে নালা লাগানো আছে। ছাদ ধুয়ে তাই বাড়ির চারপাশের নালা দিয়ে কলের মতো ঝরঝর করে জল পড়তে লাগলো। সিমাকোরির ছোট ছেলে দুটো – বনোয়ারী আর লালচনিয়া জামা কাপড় খুলে ফেলে দিয়ে উদোম হয়ে সেই জলের নীচে লাফালাফি করতে লাগলো। বৃষ্টি একটু কমে এলে বনোয়ারী এসে কাজলের কাছ থেকে একটা কাঁচের শিশি চেয়ে নিয়ে গেল।

বৃষ্টি থামতে দেখা গেল, সব জল বালিতে শুষে নিয়েছে। কিন্তু বালির নীচে একরকম ভেলভেট পোকা থাকে। ছোট ছোট Lady bug এর মতো দেখতে – শুধু ওপরটা যেন টুকটুকে লাল ভেলভেটে দিয়ে ঢাকা। জল পেয়ে তারা বালির ওপরে উঠে আসে। বনোয়ারী শিশিতে ভরে অনেকগুলো সেই ভেলভেট পোকা ধরে এনে কাজলকে দেখাতে এল। এরা মাকড়সা প্রজাতির হলে কি হবে, দেখতে চমৎকার! একটুও ভয় বা ঘেন্না করেনা। এই পোকাগুলোর নামও তীজ। তীজ পার্বণের সময় এরা বের হয়, তাই এই নাম, না এই পোকা গুলো বেরোনর সময় ওই উৎসব হয় বলে তাকে তীজ তেওহার বলে তা কে জানে!

*****

It Happened One Summer

Subhalakshmi Basu Ray

Summer stretched endlessly in the plains of Bengal, with little hope of respite, till the monsoon rains arrived. We gathered after breakfast, in the front porch of “The Gables”, (all the houses in the compound had names), screened on three sides by a leafy Rangoon Creeper, heavy with pendulous blossoms. Schools were out and being on a daily diet of Enid Blyton mysteries, we were looking for adventure that morning!

There were two mysteries waiting to be solved, right under our noses, so to speak. Behind the house, within the boundary wall, was a fenced off grassy mound of earth, that we had been wondering about for some time. The adults were clueless and did not seem to care. We considered digging till we got to the bottom of the “secret”. However, we had only two hours till lunchtime, which was barely enough.

We could, of course, sneak out during the mandatory afternoon nap, to finish the job. My brother and I often did, escaping the cool, shuttered interior of our house, for an afternoon of exploration in the shady depths of the fruit trees, at the back of the property. The “mound”, on the other hand, was pretty exposed to the elements, as well as the prying eyes of the adults. Besides digging was tedious work and hardly exciting.

We turned our attention instead, to the only bungalow in the compound which did not truly “belong”. For one thing it was “nameless”. Besides, its sole occupant was a gaunt old woman, sallow skinned, stringy hair streaked with grey, shabbily dressed in shapeless shifts, who appeared to have no connection to Burn and Co, where our fathers were employed. Her house was in a state of disrepair, with peeling paint and cracked plaster. The once handsome wrought iron front gate was rusty with age and neglect. Ripe mangoes and guavas grew in the trees of her weed choked, ruined garden. She seemed to take little interest in the fruits. Whatever the birds left untouched, fell to the ground in various stages of putrefaction.

No one ever visited her, nor did anyone ever see her leave the house. Previous efforts at making contact, selling raffle tickets for a school fundraiser for example, resulted in

her charging at us, bony arms flailing, shrieking “Chaley jao, andar kabhie mat aana”, (go away, never attempt to come inside).

We decided to storm in that morning, climbing over the front gate. The distinct possibility of being impaled on one of the finely wrought tridents that edged her gate, weighed heavily on my mind. However, I decided in favour of silence, rather than face the ridicule of my co-conspirators! Our mission was clear: collect evidence that could shed light on the identity of the “mystery woman”.

We were still in the process of fine tuning our plans, when Biru came along flashing a brand new ball, with an invitation to play cricket. The boys left, en masse, without ceremony, leaving behind Rupa and me. Barely five, she decided to run after her older brother, after a moment’s hesitation.

I stood alone, my face pressed against the delicate iron traceries of the gate, when I saw her looking at me intently. A deep hypnotic gaze, it filled me with a sense of bottomless foreboding. I wanted to break free and run but I was powerless to move. Then she was gone. No one saw her again. A heavy chain and padlock secured the gate and remained there for as long as I can remember.

*****

দিগন্ত জয়ে, দূর নরওয়ে

গৌর শীল

প্রিয় কুমারজ্যোতি,

তোমার ই-মেল পেলাম দুদিন আগে। করোনা অতিমারীর প্রকোপে সারা পৃথিবীতে যে অন্ধকার নেমে এসেছে তাতে বিগত দেড় বছর ধরে স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক জীবনযাত্রার বহু অংশই ব্যহত, আর বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ-বিদেশে ভ্রমনের যে কোন পরিকল্পনা ও তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বহু মানুষের রুজি-রোজগার। যেমন গত মার্চ মাসের মাঝামাঝি আমরা স্পেন ও পর্তুগাল যাব এমন একটা ইচ্ছে ছিল কিন্তু Covid-19-এর প্রবল ঢেউয়ে সে ইচ্ছা তলিয়ে গেছে গভীর জলের নীচে। আত্মরক্ষার তাগিদে প্রায় সকলেই তখন ঘরবন্দী। ইস্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা চালিয়েছে বাড়িতে বসে কম্পিউটারের মাধ্যমে। তবে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে হাল আমলে। সেপ্টেম্বর থেকে আবার খুলেছে অধিকাংশ বিদ্যাভবন, আর নিরাপত্তার বিধিনিষেধ মেনে বার-রেস্তোঁরা কিংবা সিনেমা-হলে যাতায়াতও ক্রমশ সম্ভব হচ্ছে বর্তমানে। কিন্তু Vacationing বা দেশভ্রমণ তেমন সহজ হয়ে ওঠেনি, ইচ্ছে আর আশঙ্কার টানাপোড়েন এখনও চলছে সেখানে। তাই দুবছর আগের Iceland ও Scandinevia সফরের পরে এখনও কোন বেড়ানোর সুযোগ আসেনি আমাদেরও।

আইসল্যান্ড Trip-এর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠিয়েছিলাম তোমায়, মনে আছে বোধ হয়। যার শিরোনাম ছিলো "দুরন্ত বাধা দিগন্ত জয়"। সেটা পড়ে তুমি আনন্দ যেমন পেয়েছো তেমনি কিছু অতৃপ্তিও বোধহয় থেকে গেছে তোমার মনে। তুমি জানিয়েছো যে, Blue Lagoon-এর কিনারায় দাঁড়িয়েও সেই নীল-সবুজ জলে না নেমে আমাদের চলে আসা তোমাকে হতাশ করেছে। “Blue Lagoon তো আর Gayser-এর ঊর্ধমুখ জলোচ্ছাস কিংবা Gulfoss-এর সদাচঞ্চল ঊর্মিরাশি নয় যে দূর থেকে দেখেই তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়া যায়। Blue Lagoon দাবী করে অবারিত অবগাহন, তার তপ্ত স্পর্শের শিহরণটুকু বাইরে থেকে অন্তরে পৌঁছে দিতে”। তোমার ওই কথার প্রতিধ্বনি নিঃসন্দেহে আমার অন্তরের গভীরে পৌঁছে তাকে নাড়া দিয়েছে বারবার।

একথা মানতেই হবে আইসল্যান্ডে আমাদের আড়াই দিনের সফরে না-দেখা রয়ে গেছে অনেক কিছুই, Blue Lagoon-এ জলে না নামা তার মধ্যে বিশেষ একটা। সেটা মেনে নিয়েই আমরা এরপর পাড়ি দিয়েছিলাম উত্তর ইউরোপের দিকে। এবার লক্ষ্য Scandinevia-র চারটি দেশ। অর্থাৎ, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও ডেনমার্ক। দেশগুলো ছোট ছোট, তাই একঢিলে চার পাখী মারার মতো অল্প সময়ে এই চারটি দেশ ঘুরে নেওয়া যায়। এমন কী Eurail কর্তৃপক্ষও এদের একটা Single দেশ হিসেবেই গণ্য করে।

আইসল্যান্ডের Reykjavik থেকে নরওয়ের Oslo আড়াই ঘন্টার উড়ান। আমাদের লাগেজ ছিল একটা মাত্র ছোট সুটকেশ আর একটা করে হাত ব্যাগ, তাই নিয়ে হাঁটা দিলাম Immigration পার হতে। কিন্তু Immigration Counter আর আসেই না! ভাবছি কেউ আমাদের আটকাচ্ছে না কেন? সামনে বেরিয়ে যাবার দরজা এসে গেল যে! Immigration ছেড়ে এসেছি ভেবে থমকে দাঁড়াতেই একজন Security অফিসার এগিয়ে এলেন। তিনি জানালেন Iceland থেকে সরাসরি বিমানে এলে Immigration Formalities লাগে না। লাগলে একেবারে গোড়াতেই সেটা করা হতো। এই দুটি দেশের মধ্যে এই বিশেষ চুক্তির কথাটা আমাদের জানা ছিলো না। অতএব আমরা Thank You বলে বেরিয়ে এলাম Arrival লাউঞ্জে।

এয়ারপোর্ট থেকে 45 কিঃ মিঃ দূরে Oslo শহরে যাবার জন্য ট্যাক্সি ছাড়াও অন্য একাধিক যানবাহনের ব্যবস্থা আছে। দুরকম Train আছে, Express আর Local - তাদের মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় আর কমখরচে যাওয়ার জন্য মজুত ছিলো Local Train। আমরা একটা 24-hour Pass কিনে নিলাম Senior discount-এ। এই Pass শহরের মধ্যেও Bus, Tram কিংবা Ferryboat-এ ব্যবহার করা যাবে। মিনিট পনের বাদে আমাদের ট্রেন রওনা হোল Oslo-র দিকে। ঝকঝকে ট্রেনের কামরা, বসবার কিংবা মালপত্র রাখার কোনো অসুবিধা নেই। রেলপথের দুপাশে খোলামেলা মাঠ, মাঝেমধ্যে দু-একটা টিলা কিংবা ছোটছোট কয়েকটা বাড়ি। মিনিট দশেক পরে একটা ষ্টেশন এলো। ছিমছাম উপনগরী Littlehammer দাঁড়িয়ে আছে কয়েক সারি অনতিউচ্চ বাড়ি ও নাতিদীর্ঘ রাস্তা নিয়ে। এর পরে আরও বারো মিনিট চলার পরে Central South Sration পৌঁছে গেল ট্রেনটা। Oslo শহরের ডাউনটাউন। দূর থেকেই স্টেশনের কাছাকাছি Oslo-র Artistic Landscape Skyline চোখে পড়েছিল। একসারি বহুতল বাড়ি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যেন Art and Architecture-এর এক একটি Display হয়ে। শহরের অন্যতম প্রধান প্রবেশের দরজায়।

ট্রেন থেকে নেমে Platform দিয়ে হেঁটে চলে এলাম আমরা স্টেশনের আর এক দিকে। বিশাল সেন্ট্রাল স্টেশন চত্বরে একটা Burger King-এর দোকান ছিলো সেখানে লাঞ্চ সেরে বাইরে আসা গেল। সামনেই জনবহুল রাজপথ, বাস-ট্রাম-ট্যাক্সি সবই হাতের কাছে। আমাদের সঙ্গে লাগেজ অল্পই, তাই এরপর একটা ট্রামে উঠে ছটা স্টপ গিয়ে নামলাম আমরা। সেখান থেকে কয়েক মিনিট গেলেই আমাদের Apartment-Hotel পাওয়া গেল। কিন্তু জায়গা পাওয়া গেল না। আমরা নাকি ভুল জায়গায় চলে এসেছি। বোঝো ঠেলা! আমাদের বুকিং নাকি এদের অন্য একটা Branch-এ, সেখানেই যেতে হবে, প্রায় ১ কিঃ মিঃ দূরে। এখানে No vacancy। একটা ম্যাপে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন এখানকার অফিসের এক তরুণী।

অগত্যা রাস্তায় নেমে হন্টন। কাঁধে ব্যাগ আর হাতে চাকা লাগানো ছোট সুটকেশটা টানতে টানতে মিনিট পনের গিয়ে তবে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছানো গেল। দেখা গেল বাইরের দরজায় ইলেকট্রনিক তালা লাগানো। একটু কসরত করে আমরা Coded 'চাবি' হাতে পেলাম Computer-এর সৌজন্যে, তারপর Elevator ধরে চারতলায় উঠে আমাদের ঘরে। কীচেন-বাথরুম-বেডরুম নিয়ে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ Mini-Apartment-এর মতো। জানালা দিয়ে রাস্তার দৃশ্য, ট্রাম-বাস লোকজন অল্প-বিস্তর দেখা যাচ্ছিলো। বিকেলের আলোয় ব্যস্ত শহরের ছবি।

আমরা হাতমুখ ধুয়ে কীচেনে গেলাম কফির খোঁজে। কফি বানানোর উপকরণ আর সরঞ্জাম সবই মজুত ছিলো. আর আমাদের সঙ্গে ছিল স্ন্যাক্স । কফিপান শেষ হলে তারপর বেরিয়ে পড়লাম শহরটা কিছুটা ঘুরে দেখতে। আমাদের হোটেলের খুব কাছেই একটা Taxi-stand ছিল। আমরা একটা ট্যাক্সি অগ্রিম বুকিং করে রাখলাম পরের দিনের জন্যে, ভোর ছটার ট্রেন ধরতে হবে ঐ Central স্টেশন থেকেই। তারপর একটুখানি হেঁটে একটা ট্রাম ষ্টপে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা। সামান্য পরেই এসে গেল একটা ট্রাম, আমরা উঠে বসলাম তাতে। দশ মিনিট পরে ট্রামগাড়ি আমাদের নিয়ে এলো একটা দেয়ালঘেরা পার্কের প্রবেশপথে। নাম Vigeland Sculpture Park । এই World Heritage তকমাধারি পার্কটি অসলো শহরের অন্যতম বিশেষ সম্পদ। পৃথিবীর সব চেয়ে বড়ো এই স্থাপত্য-উদ্যান ২১২-টি Bronge ও Granite-এর নগ্নমূর্তি দিয়ে সাজানো - তার মধ্যে কয়েকটি উদ্ভট কিংবা উৎকট মনে হতে পারে - তবুও মোটের ওপর বিস্ময়কর এবংমনোরম স্মৃতি জাগিয়ে রাখে নিঃসন্দেহে। এই উদ্যানে ঢুকতে কোনো দর্শনি লাগে না আর এটা সারা বছর ধরে প্রতিদিনই ২৪-ঘন্টা খোলা থাকে। প্রায় দেড় ঘন্টার মতো এখানে ঘুরেফিরে আমরা বাইরে এলাম। তবে সময় থাকলে তিন-চার ঘন্টা অনায়াসে কাটানোর মতো জায়গা।

স্থাপত্য-উদ্যানে এত হাঁটাচলা করে খিদে পেয়ে গিয়েছিল আমাদের। বাগানের কাছাকাছি কোথায় কি পাওয়া যাবে জানা নেই তেমন। তাই ট্রামে চেপে আবার রেলষ্টেশনে গেলাম ফিরে, সেখানে চিরপরিচিত Macdonald-এ খাওয়া সারতে। তারপর আবার ট্রামে উঠে চললাম হোটেলে ফেরার পথে। তখনো কিছুটা আলো ছিলো। ঠিক হলো আরো কিছু সময় বাইরে কাটানো যেতে পারে। তাই মাঝপথে ট্রাম থেকে নেমে চলে এলাম জলের ধারে Oslo City Hall-এর মুখোমুখি Pier No 1 ফেরীঘাটে। এখান থেকে রুটিনমাফিক ফেরী যাতায়াত করে Oslofiord-এর কয়েকটা দ্বীপে। আমরা চটজলদি একটা ফেরীবোটে উঠে পড়লাম সান্ধ্যভ্রমণের মেজাজে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছাড়লো জলযান, এগিয়ে চললো তার নির্দিষ্ট পথে। লোকজনের ভিড় ছিল না তেমন, আমরা কাঁচের জানলার ভিতর দিয়ে দেখছিলাম শেষ বিকেলের আলো মুছে যাচ্ছে আকাশ থেকে। প্রায় আধঘন্টা পরে ফেরীবোট গিয়ে পৌঁছালো একটা মাঝারি আকারের দ্বীপে। কিছু কিছু ঘরবাড়ি আর প্রশস্ত সৈকত চোখে পড়লো। দিনের বেলা পিকনিক্ করতে আসে স্থানীয় লোকেরা এখানে। আমরা অবশ্য নামলাম না এই ভর সন্ধ্যায়। ফিরতি Trip-এ দূর থেকে Oslo শহরের আলোকসজ্জা দেখতে দেখতে ফেরীঘাটে পৌঁছে গেলাম। সেখান থেকে আবার ট্রামে চেপে হোটেলে ফিরে আসতে কোনও অসুবিধা হয় নি।

পরের দিন আমাদের পরিকল্পনা ছিলো নরওয়ে দেশের বিস্ময়কর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। আমরা বেছেছিলাম Norway in a nutshell প্রোগ্রামটি, যার মধ্যে রয়েছে চারটি অভিযান; তার দুটি অংশের বাহন ট্রেন, তৃতীয়টির জন্য জাহাজ আর চতুর্থ পর্যায়ে মোটরবাস। প্রথম অংশের ট্রেনযাত্রাটির শুরু সকাল ছটা ২০ নাগাদ Central Station থেকে। তাই আমরা ভোর পাঁচটায় ট্যাক্সি বুকিং করেছিলাম। Taxi সময়মতো এসে আমাদের নিয়ে ষ্টেশনে পৌঁছে দিলো মিনিট কুড়ি বাদে, ভাড়া লাগলো $45। সকালে কিছু খাওয়া হয়নি, আমরা Croissant আর কফি দিয়ে কন্টিনেন্টাল breakfast সারলাম, কিছু Snacks-ও কিনে রাখা হোলো।

এরপর আমরা প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ালাম। আরো অনেক লোক ছিলো সেখানে। একটু পরেই এলো Oslo – Bergen express। আমাদের Eurailpass টিকিট, তাতে কোন Seat number দেওয়া নেই! তার মানে আমাদের খালি যায়গা খুঁজে বসতে হবে। কিন্তু কোন সিটেই লেখা নেই সেটা খালি না reserved। আমরা একজায়গায় গিয়ে বসলাম, ট্রেনও ছেড়ে দিলো ঠিক সময়ে। কিন্তু একটু পরে দুজন যাত্রী এসে দাবী করলো যে ওই দুটো সিট ওরা রিজার্ভ করেছে Fee দিয়ে। অতএব আমাদের অন্যত্র খালি সিট খুঁজে বসতে হোল। আমাদের বারবার এই ঝামেলায় পড়তে হোল। এদিকে ট্রেন তখন ছুটছে Oslo-র বাইরে। দারুন সব দৃশ্য চলে যাচ্ছে, কিন্তু সেসব দেখার ফুরসত হচ্ছে কই?

কি করা যায়? ট্রেনের Conductor-কে গিয়ে জিগ্যেস করতে জানা গেল যে অবস্থা সুবিধের নয়। সমস্ত regular seats অগ্রিম রিজার্ভ হয়ে গেছে আর সেই যাত্রীরা অধিকাংশই যাবে Myrdal ষ্টেশন পর্যন্ত আমাদের মতোই। আমরা আমাদের টিকিট দেখিয়ে বললাম যে Eurailpass কোম্পানি আমাদের reservation করতে বলেনি। কিন্তু জায়গাই যদি না থাকে তবে এই সব আবেদনে নতুন সীট তো তৈরী করা সম্ভব নয়। তবে শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবস্থা হোল Conductor মশায়ের সৌজন্যে। ট্রেনে একটা স্পেশাল কামরা ছিলো - যেটা ছোটো ছোটো বাচ্ছাদের Playroom হিসেবে ব্যবহার করা হয় – সেখানেই আমাদের জায়গা হোলো।

এইবার সময় পাওয়া গেল বাইরের দিকে নজর দেওয়ার। Oslo থেকে Bergen-গামী এই ট্রেনটি সুপরিচিত তার যাত্রাপথের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সুবাদে, অনেকে একে য়ুরোপের সেরা বলেও মনে করে থাকেন। ট্রেনপথের দুপাশে কোথাও সবুজ বনানী, কোথাও শুভ্র হিমবাহের স্তব্ধমূর্তি আবার মাঝেমাঝে সুদীর্ঘ ফিয়র্ডের বুকে পাথরের দেওয়াল বেয়ে নেমে আসা কোনও পাহাড়ি ঝরণার কলরোল। ট্রেনের প্রতিটি বাঁকে নতুন চমক আর নতুন বিস্ময়ের হাতছানি ক্যামরায় বন্দী করতে যাত্রীরা সকলে উৎসাহে মুখর ও চঞ্চল হোল।

প্রায় পাঁচ ঘন্টা সময় কেটে গেল দ্রুতগতিতে। বেলা ১১টা বেজে গেছে ইতিমধ্যেই। Myrdal ষ্টেশনে নামবার প্রস্তুতি শুরু হোল এবার। এর পরের পর্যায়ে রয়েছে ৫৫ মিনিটের একটা ট্রেনসফর, যার নাম Flamsbana । Myrdal থেকে ঢালুপথে Flam পর্যন্ত এই রোমাঞ্চকর ট্রেনসফরটিকে সবাই একবাক্যে অবিস্মরণীয় বলে মেনে নিয়েছে।

আমাদের এই রেলগাড়ি Myrdal পৌঁছবে ১১টা ৩৪-এ। অন্য ট্রেনটা ছাড়বে ৩৫ মিনিট বাদে। তাই Platform বদলাতে যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। এবার আমাদের সীট অগ্রিম বুক করা আছে, অতএব টেনশনের কিছু নেই। আমরা জিনিষপত্র গুছিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিন্তু একটু পরেই আমাদের ট্রেনটা থেমে গেল বিনা নোটিশে। কোন ষ্টেশন দেখা গেল না। আমরা ভাবছি এই বুঝি আবার ছাড়বে। এই ভাবে আধঘন্টা সময় কেটে গেল। আর দশ মিনিট বাদেই Flam-গামী ট্রেনটি ছেড়ে দেবার

কথা। ঐ ট্রেন কি অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে? এইসব চিন্তা করতে করতে আরো খানিক সময় গেল। তারপর রেলকোম্পানীর একজন প্রতিনিধি ভদ্রমহিলা এলেন আমাদের কামরায়। তিনি যা জানালেন তার সারমর্ম এই : Myrdal থেকে Flam-এর ট্রেনটা আজ চলছে না, কারণ গতকাল একটা Accident হয়েছিলো, ওই Track-এ (পরে জেনেছিলাম যে Track-এ উঠে আসা একটা গোরুর সঙ্গে ট্রেনের ধাক্কা লাগে!)। ট্রেনের পরিবর্তে আমাদের বাসে করে Flam-এ পৌঁছে দেওয়া হবে। অতএব ট্রেন থেকে নেমে আমাদের Bus Station-এ যেতে হবে। পায়ে হেঁটে।

আমরা মালপত্র সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রথমে ষ্টেশনের বাইরে এলাম। তারপর আরও কয়েক ব্লক হেঁটে Bus-stand পাওয়া গেল। সেখানে আমাদেরই মত প্রচুর যাত্রীর ভীড়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের একটা Bus-এ তুলে দেওয়া হোল। কিন্তু আরো চারজন যাত্রী যাবে এই বাসেই – তারা রাস্তা ভুল করে অন্যদিকে চলে গিয়েছিলো - তাদের আসার অপেক্ষায় আমরা বসে রইলাম। Bus-a Wifi ছিলো, তাই এই সময় একটা Text Message পাঠালাম বিভাসদাকে। Diplomatic Service-এর বিভাসদাকে তুমি তো চেনো, এখন Reykjavik, Iceland-এ উনি posted । বিভাসদা ও স্বাগতাবৌদি নরওয়ে ঘুরে গেছেন জানি, দুদিন আগেই ওঁদের সঙ্গে দেখা করে এসেছি Reykjavik-এ। বিভাসদার অভিজ্ঞতার ভান্ডার বেশ বড় --ভাবলাম আমাদের বর্তমান অবস্থায় তিনি কি পরামর্শ দেন শোনা যাক।

একটু পরেই বিভাসদা Textback করলেন। Text-এর মাধ্যমে আমাদের কথোপকথন যা হয়েছিলো তা নীচে লিখছি।

বিভাসদা : কি বীরু, এত কান্নাকাটি কিসের? কোথায় তোমরা এখন?

আমি : আমরা মনে হচ্ছে একটা গাড্ডায় পড়েছি বিভাসদা। Norway in a nutshell প্রোগ্রামে আজ সকালে Oslo থেকে Myrdal-এ পৌঁছেছি । তারপর আর একটা স্পেশাল ট্রেনে Flam যাবার কথা। কিন্তু তার বদলে আমরা একটা Bus-এ বসে আছি।

বিভাসদা : ঐ Program-টা আমি জানি। তা সে Flambana ট্রেনটা চলছে না কেন?

আমি : শুনলাম যে একটা minor accident-এর জন্যে Myrdal-Flam লাইন বন্ধ। আমাদের বাসে করে Flam-এ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারপর বোধহয় We are on our own । Flam থেকে আমাদের যে Boat-এর টিকিট কাটা রয়েছে সেটা already ছেড়ে দিয়েছে। We have missed the boat!

বিভাসদা : আরে বীরুভাই অত ঘাবড়াবার কিছু নেই। Boat দিনে তো শুধু একবার নয়, কয়েকবার। অতএব তোমরা পরের Boat-এ উঠবে। তোমাদের যে টিকিট আছে সেটা ওরা exchange করে দেবে এর জন্যে তোমাদের কোনো খরচ নেই! মনে রেখো তোমরা কোনো ভুল করোনি। তোমাদের দোষে Flambana বন্ধ হয়নি। তোমাদের একটা Refund পাওনা।

আমি : Refund কিসের বিভাসদা?

বিভাসদা : কিসের আবার? Myrdal-Flam ট্রেনের টিকিটগুলো তোমরা ব্যবহার করতে পারছো কী? তার দাম পুরো Refund হবে। এখন Bus-এ Flam-a পৌঁছে যাও নিরাপদে। আশা করি Sonefjord-এ Boat trip আর Return Bus trip দুটোই খুব Enjoy করবে। Good luck!

আমি : অসংখ্য ধন্যবাদ বিভাসদা। ভালো থাকবেন। বৌদিকে আমাদের নমস্কার দেবেন।

আমাদের Bus খানিক আগেই চলতে শুরু করেছে সব যাত্রী নিয়ে। Myrdal সমতল থেকে ২৮০০ ফুট ওপরে। সেখান থেকে Flam-এ নামতে থাকল Bus । কখনো সামনে, কখনো পাশে যেন পাথরের দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে একের পর এক, আর বড়ো-ছোট নানা মাপের প্রপাতের ধারা নেমে আসছে সুদূর Fiord-এ ঐরকম একটা Fiord-এর ওপর দিয়ে ঘুরে আসার টিকিট কেটেছি আমরা, দেখা যাক সে আশা পূরণ হয় কিনা।

ঘন্টা দুয়েক পরে আমরা Flam-এ পৌছলাম। একটু দূরেই বোট কোম্পানীর অফিস। সেখানে একটা Counter-এ খোঁজ নিলাম পরের Boat কখন ছাড়বে। উত্তরে মহিলা জানালেন যে আমাদের আর এক জায়গায় গিয়ে ভিন্ন কোম্পানির বোট ধরতে হবে। সেইমত আমরা এগিয়ে গেলাম খানিকটা। একটা খালি বোট দাঁড়িয়ে ছিলো, ভেতরে দুজন কর্মচারী। আমাদের টিকিট দেখে একজন আশ্বাস দিলো আর আধঘন্টা বাদে একটা অন্য জাহাজ ছাড়বে এখান থেকেই, আমরা তাতেই যেতে পারবো। তখন "জয় মা দুর্গা" বলে আমরা একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। হাতব্যাগে চিপস্ আর চকোলেট ছিলো, তাই খেয়ে খিদে মেটানো হোল। লাঞ্চ খাওয়ার সুযোগ ছিল না এত হড্ডাবড্ডার মধ্যে।

মিনিট কুড়ি পরেই একটা ছোট জাহাজ এসে দাঁড়ালো সামনে। আমরা সবার আগে উঠলাম। তাছাড়া একটা বড় চাইনীজ দল ছিল। এতেই জলযান প্রায় ভরতি হয়ে গেল আর কয়েক মিনিট বাদেই শুরু হোল আমাদের ফিয়র্ড পরিক্রমা। প্রথমে পড়ল অনিন্দ্যসুন্দর Aurlandsfjord তার নয়নমনোহর দৃশ্যাবলী নিয়ে। তার পরে, সুউচ্চ পাহাড়ে ঘেরা ক্ষীণতনু Naeroyfjord তার নাটকীয় সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে দেখা দিলো...এর গায়ে World Heritage-এর তকমা আঁটা। সব মিলিয়ে দেড় ঘন্টার ওপর চক্ষুকর্ণের এক লাগাতার ভুরিভোজ!

ফিয়র্ড-পরিক্রমা শেষ করে আমরা নামলাম এক গ্রামের ধারে, নাম তার Gudvangen। সেখান থেকে একটা Bus আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে Voss রেলষ্টেশনে। সেখান থেকে আবার Main লাইনের Train। একটু পরেই Bus এসে গেল আমাদের তুলতে। সোজা Main রাস্তায় না গিয়ে Bus-টা ধরলো একটা Scenic Route । সে পথের মুখ্য আকর্ষণ বলা যেতে পারে তার নিঃশ্বাস বন্ধ-করা চুলের কাঁটার মতো ১৮০ ডিগ্রীর বাঁকগুলো পার হওয়ার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। এ ছাড়া পাহাড়ের ভেতর থেকে তরতরিয়ে বেরিয়ে আসা জলপ্রপাতের কলধ্বনি আর নয়নমনোহর প্রকৃতির বুকে ছবির মতো সাজানো ছোট ছোট গ্রামগুলির শোভাও কম চিত্তাকর্ষক নয়।

Voss ষ্টেশনে পৌঁছতে ঘন্টাখানেক লাগলো। এখানেই সাঙ্গ হোল আমাদের Norway In A Nutshell program। Myrdal-Flam ট্রেন বন্ধ থাকায় একটা অতুল অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম অবশ্য। Program-এর অন্য অংশগুলো বেশ ভালোভাবেই Enjoy করা গেছে এই যা সান্ত্বনা।

Voss ষ্টেশন থেকে আমরা Oslo-র বিপরীতে Bergen-এর দিকে চললাম একটা local ট্রেনে। প্রায় সওয়া ঘন্টা বাদে নরওয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরে ট্রেন থামলো। তখন দিনের আলো বেশ কমে গেছে। ঘড়িতে সময় সাড়ে নটা। গরমকাল না হলে অন্ধকার হয়ে যেত অনেক আগেই।

আমাদের হোটেল ষ্টেশন থেকে খুব দূরে নয়, আবার হেঁটে যাওয়া যাবে এমন কাছেও নয়। Bergen শহরে Public Transport মূলতঃ Light Rail কিংবা Bus — ট্যাক্সির খরচ অনেক। ষ্টেশনের বাইরে খুব কাছেই একটা Light Rail-এর Stop ছিল, সেখানে টিকিট কাটা হল অটোমেটিক মেশিন থেকে। পাঁচ মিনিট পরে এলো রেল, আমরাও উঠে পড়লাম মালপত্র নিয়ে। আমাদের যেতে হবে ছটা Stop। সেই স্টপে নেমে দুটো ব্লক দূরেই হোটেল পাওয়া গেল। কিন্তু হোটেলটা Self-Service অর্থাৎ সেখানে কোন রিসেপশন কাউন্টার নেই। আমরা আমাদের Booking No পাঞ্চ করে নিজেরাই Registration করলাম। তারপর হাতে Magnetic Key নিয়ে Lift-এ চেপে চারতলায় আমাদের ঘর পাওয়া গেল।

রাত দশটা বেজে গেছে ইতিমধ্যে। কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলাম ঘর বন্ধ করে। হোটেলের নীচে কোনও Restaurant বা Cofee-shop নেই। এক Block দূরে একটা Pizzeria চোখে পড়লো কিন্তু সেটাও তখন বন্ধ হয়ে গেছে। শেষে একটা Gas-Station পাওয়া গেল যার মধ্যেই ছিলো একটা Food Store। আমরা সেখান থেকেই রাতের ও পরের দিনের Breakfast-এর জন্য যা পাওয়া গেল কিনে ফিরে এলাম হোটেলে। তারপর চটপট খাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে। তখন প্রায় রাত বারোটা ।

পরেরদিন সকালে উঠে আমরা তৈরী হলাম সময়মত। Oslo ফেরার ট্রেন ছাড়বে আটটায়। আমরা light breakfast সেরে পৌনে সাতটার মধ্যে Ready। তারপর হোটেল থেকে বেরিয়ে Light Rail ধরে ট্রেন ষ্টেশনে চলে এলাম সহজেই। তখন চেষ্টা করলাম যদি দুটো Reserved সীট জোগাড় করা যায়। কিন্তু এখানেও এক গল্প, ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই! তবে ট্রেন Conductor আশ্বাস দিলেন যে Final প্যাসেঞ্জার লিস্টটা পেলে উনি চেষ্টা করবেন আমাদের দুটো জায়গা দিতে যদি Cancellation হয়ে থাকে। ট্রেন ছাড়তে তখনো কিছু বাকী ছিলো। যাত্রীরা অধিকাংশ ইতিমধ্যে যে যার জায়গায় বসে পড়েছে। দুচারজন তখনো ঢুকছে Platform-এ। আমরাও দাঁড়িয়ে আছি সেখানে। মিনিট দশেক পরে Conductor সাহেবকে আমাদের দিকে আসতে দেখে মনে আশা হলো। তিনি জানালেন কয়েকটা Cancellation হয়েছে, অতএব “You are OK”। আমাদের Seat Number তখুনি বলে দিলেন আর আমরাও “Many, many thanks” বলে আমাদের কামরায় উঠে পড়লাম। ট্রেন ছাড়তে আর দেরী নেই।
Bergen থেকে Oslo যাওয়ার পথে উল্লেখযোগ্য কোনও ঝামেলা হয় নি। ট্রেন ছুটে চলেছিল তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আর বাইরের নিত্যচঞ্চল নিসর্গসুষমা অভিভূত করে রেখেছিলো আবারও। ট্রেনে একটা Snackbar ছিলো, সেখান থেকেই খাদ্যপানীয় সংগ্রহ করে দুপুরের খাওয়া সারা হোল। বেলা আড়াইটে নাগাদ আমরা Oslo পৌঁছলাম। তখুনি হোটেলে না গিয়ে আমরা উঠে বসলাম একটা Hop-On-Hop-Off বাসে। এই বাসে ১১-টা Stop ছিলো। শহরের প্রায় সবকটি উল্লেখযোগ্য জায়গার পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে বাসটা এগিয়ে চলে, লাগাতার ধারাবিবরণী দিতে দিতে। আমরা পুরো একটা Round দিলাম – পথে পড়লো নরওয়ের রাজপ্রাসাদ, পৌরভবন, নোবেল শান্তিসৌধ, লোকসভাভবন, Vigeland স্থাপত্য উদ্যান আর পাঁচ-ছটা মিউজিয়াম। কোথাও নেমে খতিয়ে দেখার পরিকল্পনা পরের দিনের জন্য মুলতুবী রইলো। আমরা বাস থেকে নেমে হাঁটাপথেই আমাদের নির্দিষ্ট হোটেলে পৌঁছলাম। চেক-ইন শেষ করে আমাদের ঘরে গিয়ে একটুখানি বিশ্রাম। তারপর নীচে নেমে হোটেল-সংলগ্ন রেস্তোরাঁতে ডিনার সেরে ফিরে আসা। একবার পরের দিনের Plan-টায় চোখ বুলিয়ে দেখা হোল নরওয়ে ছেড়ে আমাদের আগামীকাল বিকালে সুইডেনে পাড়ি দিতে হবে। এখানে আজ শেষ রজনী।

পরের দিন সকালে মালপত্র গুছিয়ে আমরা তৈরী হয়ে নেমে এলাম হোটেলের লবিতে। Breakfast সেরে আমাদের লাগেজ হোটেলে জমা রেখে বেরোলাম গতকালের মতো HOHO বাস ধরতে। আমাদের আগের দিনের টিকিট আজও চালু থাকবে বিকেল পর্যন্ত। নটা নাগাদ Bus ছাড়লো। প্রথমে গেলাম Radhus বা Oslo City Hall-এ। এই বিল্ডিংটা স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন হিসাবে তেমন আকর্ষণীয় লাগলো না। দুটি মাঝারী উচ্চতার Tower দুপাশে, মধ্যে Central Block । এই পৌরভবনের Main Hall-এ প্রতি বছর ১০ই ডিসেম্বর নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে। City Hall-এর খুব কাছে Nobel Peace Center নামে একটা চমৎকার মিউজিয়ম রয়েছে; এখানে নোবেলজয়ী

মনীষিদের কাজের নমুনার প্রদর্শনীটি বিশেষ দ্রষ্টব্য। এর ভিতরের Cafeteria-তে আমরা কফি ও ক্রসোঁয়া নিয়ে কিছুটা সময় কাটালাম।

এরপরে Royal Palace। রাজভবনের গেট থেকে বেশ খানিকটা হেঁটে পৌঁছান যায় প্রশস্ত প্রাসাদের সামনে। আমরা সেখানে আরো অনেক দর্শকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলাম। একটু পরে Change of Guard অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। চল্লিশ মিনিট ধরে এই প্যারেড চলে। সবটা দেখার অবশ্য বাধ্যবাধকতা নেই। আমরা মিনিট পনের পরে বেরিয়ে এলাম Palace-র বাইরে। কেউ কেউ রাজপ্রাসাদের ভেতরে ঢুকে Tour করার টিকিট কিনছিল। আমাদের তাতে তেমন উৎসাহ বা আগ্রহ ছিল না। আমরা আবার বাসে উঠলাম। এবার চারটে স্টপেজ পার হয়ে নামলাম Viking Ship Museum-এর সামনে। প্রবেশ মূল্য দিয়ে আমরা ভেতরে গেলাম। এই Museum-এর মুখ্য আকর্ষণ নবম শতাব্দীতে তৈরী তিনটি কাঠের ভাইকিং রণতরী। তার মধ্যে Oseberg Ship-টি তুলে আনা হয়েছে জলের তলা থেকে পৃথিবীর বৃহত্তম তরণী-সমাধির গ্রাস থেকে উদ্ধার করে। এদের প্রত্যেকটির অনবদ্য কারুকার্য নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর।

Ship Museum-এর পর আমরা ফিরে এলাম হোটেলে আমাদের মালপত্র নিতে। তারপর সোজা গেলাম Central Station। এখান থেকেই ছাড়বে Oslo-Stockholm Express ঘন্টা খানেক বাদে। সামনের Electronic বোর্ডে সময় ও Platform নাম্বার দেখা যাচ্ছিলো। আমরা সেই নির্দিষ্ট Platform-এ নেমে এসে একটা বেঞ্চে আশ্রয় নিলাম।

Scandinavia-র একটি দেশ সফরের বিবরন দিয়েই শেষ করলাম এবার। অন্য তিনটি দেশের কথা পরের বার লিখবো আশা রইলো।

দুরন্ত বাধা দিগন্ত জয়
নদী গিরি মরু পাড়ি নির্ভয়
ধায় ভীমবেগে অশান্ত ট্রেন
বিদায় নরওয়ে, চলো সুইডেন

*****

কোভিড, সাইকেল ও আমি

ইন্দ্রাণী চৌধুরী

সুদূর কানাডায় এসে সংসার পাতলাম চল্লিশের শেষে, শুধু ছেলেমেয়েদের কাছে পাব বলে। কিন্তু ছেলেমেয়েরা একে একে বাসা ছেড়ে উড়ে গেল, আমি ৫০ ছাড়ালাম। হাতের কাজ কমল; নাচের স্কুল, দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ান, নানা শখ-পূরণ আর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে হইচই করে সময় কাটাই। এমন সময় এলো মহামারী COVID-19, পৃথিবী হার মেনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল যেন; জীবন বাঁচাতে আর সবকিছু অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেল! অফিস-কাছারী, স্কুল-কলেজ, সিনেমা-মল, বাস-ট্রেন-প্লেন... সব বন্ধ হয়ে গেল! শুধু প্রয়োজনীয় বাজার-হাট, ওষুধের দোকান, হাসপাতাল খোলা ছিল প্রথম দিকে। বাজার করা আর কাছাকাছি হাঁটতে বেড়ানো- এই করতাম কর্তা-গিন্নী দুজনে। গাড়ির নিচে ঘাস গজাচ্ছে, কিন্তু কোথাও যাবার উপায় নেই- 'Stay home, stay safe'! বাচ্চাদেরও কড়া বারণ! একদিন দেখলাম পাশের বাড়ির অশীতিপর দম্পতি সাঁ করে সাইকেল নিয়ে বেড়িয়ে গেল- মাথায় হেলমেট পরে, দুটো বাচ্চা ছেলেমেয়ের মত উদ্দামতা নিয়ে। হঠাৎ মনে হ'ল, আমিও সাইকেল কিনব! মনের কোণে পড়ে থাকা শৈশবের শখটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল! জীবনে কোন কাজে যে আমাকে কখন বাধা দেয়নি সে সাথে করে নিয়ে গেল ওর পঞ্চাশোর্ধ বউ এর ছেলেমানুষী শখ মেটাতে! কি সৌভাগ্য ওই সময় কিছুদিনের জন্য রাস্তার ধারের non-essential দোকানগুলো খুলেছিল আর আমরা প্রথম দিকেই গেছিলাম; পরে শুনেছিলাম সব দোকানের সব সাইকেল বিক্রি হয়ে গেছে, এবারে নাকি মাত্রাতিরিক্ত বিক্রি হয়েছে! সপ্তাহ দুয়েক প্রতিদিন বিকেলে দুজনে মিলে সাইকেলটা ঠেলে-ঠেলে সামনের একটা বিশাল car-park এ গিয়ে চালানো রপ্ত করতাম! আস্তে আস্তে পোষ মানল সাইকেল, সাহস করে একা-একা বেড়িয়ে একটু দূরে যেতে শুরু করলাম; এ পাড়া থেকে পাশের পাড়া, পাশের গলি থেকে অচেনা গলি ধরে গিয়ে পড়তাম এক চেনা রাস্তায় - মনে মনে নিজের নতুন নতুন অভিযানে নিজেই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠতাম; ভাবতাম কবে হাঁটতে বেরিয়ে ওকে নতুন রাস্তায় নিয়ে গিয়ে তাক্ লাগাবো! কলকাতাতে যে কারণে আমি কখনো সাইকেল চালাইনি- কলকাতার রাস্তা কখনো নিরাপদ মনে হোতনা, আত্মবিশ্বাসের অভাব বোধ করতাম! প্রথম প্রথম এখানেও আমি ফুটপাথ দিয়ে চালাতাম, রাস্তায় নামতে ভয় পেতাম! শুনে ছেলেমেয়েরা বলল সেটা নাকি বে-আইনী; ফুটপাথ শুধু পথচারীদের জন্য। অগত্যা আমায় রাস্তায় নামতেই হোল; নেমে দেখলাম ভালোই করেছি, চালানোতে অনেক আরাম। এখানে মসৃণ, সুন্দর সাইকেলের জন্য দাগকাটা রাস্তায় আমার ছোট্ট, ছিমছাম সাইকেল আর তার ওপর আমি- যেন আল্লারাখা আর রবিশঙ্কর জুটি! সাইকেলের জন্য হেলমেট হোল, পোষাক, গগলস... সব একে-একে কিনলাম; আমার সমস্ত মন জুড়ে এখন সাইকেল- নতুন অভিজ্ঞতা আস্বাদনের আনন্দ-উত্তেজনাতে আমার বয়েসই কমে গেল! শুরু করলাম ছোটখাট বাজার করা! পিঠে ছোট্ট ব্যাকপ্যাক নিয়ে, তার মধ্যে আছে তালা-চাবি, আমি যেতাম দোকানে। সেখানে সাইকেলে তালা-চাবি লাগিয়ে বাজার করে, সব জিনিস আমার ব্যাকপ্যাকে ঠেলে ঢুকিয়ে, সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরতাম। মুস্কিল হল দোকানে গেলে কখনই এত কম বাজার করতে পারিনা; একবার অনেক বেশি জিনিস কিনে সেগুলো কিছুতেই আর ব্যাকপ্যাকে আঁটাতে পারিনা! শেষে কর্তাকে ফোনে তলব করে বাজার ওর গাড়িতে তুলে, দুজন দুজনের বাহনে সওয়ার হয়ে বাড়ি ফিরলাম! Lockdown এর মধ্যে এরকম রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চার মন্দ কি?

এইভাবে একটা গ্রীষ্ম কেটে গেল। বছরের বাকি সময়টা সাইকেল পড়ে থাকল আমাদের বেসমেন্টে। শীত কেটে বসন্ত এলো। সারা পৃথিবীতে অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি- Covid variant এর একটার পর একটা আছড়ে পড়া ঢেউয়ে মানুষেরা নাস্তনাবুদ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে! পুরো না হলেও আংশিক lockdown সবসময় বহাল রয়েছে; এরই মধ্যে তাড়াহুড়ো করে এসে গেল vaccine; কানাডায় vaccine দেওয়া শুরু হোল অনেক দেরী করে, ততদিনে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্ত থেকে vaccine প্রয়োগের সুফলের খবর আসছে, মানুষ আবার আশায় বুক বাঁধছে, মনে শান্তি ফিরে পাচ্ছে। কিন্তু গোটা দেশে সবার দুটো করে vaccine না হওয়া পর্যন্ত লোকজনের মধ্যে মেলামেশা স্বাভাবিক

হবেনা, অতএব এই বছরও বসন্ত, গ্রীষ্ম, এমনকি হেমন্তেও আমার সাইকেলই ভরসা! দোকান থেকে চাকায় হাওয়া ভরে, চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ব্রেক-গীয়ার পরীক্ষা করে, তেল খাইয়ে আমার এক বছরের পুরোন সাইকেলটাকে একেবারে নতুন করে ফেললাম। ইতিমধ্যে কোভিড-সহ জীবন আমাদের বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। স্কুল-কলেজ, অফিস, জন্মদিন-বিয়ে, পুজো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান... সবই হচ্ছে online; জুম-গুগল মীট কি করে পরিচালনা করতে হয়, আমরা জেনে গেছি; এছাড়া আছে ফেসবুক আর ইউটিউব। নাচ নিয়ে থাকার দৌলতে অনেক ভার্চুয়াল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকি, কোথাও দর্শক আবার কোথাও শিল্পী হিসেবে। ভাবতে ভালো লাগে শহর-দেশের গন্ডি ভেদ করে আজ কোভিডের জন্য আমরা বিশ্বমঞ্চে একত্রিত হতে পেরেছি, সেই বীটল্স এর গানের মত- 'imagine there's no countries...'! যাইহোক, এইসব কারণে দিনের অনেকটা সময় আমার কেটে যায় মুঠোফোনের সাথে, কে যে কার মুঠোবন্দী বোঝা দায়! এরকমভাবেই ফেসবুক-এ মে মাসে একটা পোস্ট চোখে পড়ল- Great Cycle Challenge Canada সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে পুরো অগাস্ট মাসটা সাইকেল চালিয়ে অসুস্থ বাচ্চাদের জন্য পয়সা তুলতে! অনেক তহবিলে অনুদান দিয়ে থাকি কিন্তু নিজের পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করা সেইসব বাচ্চাদের জন্য যারা জীবনটা কি জানার আগেই বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছে- এই মহৎ উদ্দেশ্যর তাড়না আমার প্রতিটা রোমকূপে সঞ্চারিত করে সাইকেল চালানোর কল্পনাতীত ইচ্ছা আমাকে আচ্ছন্ন করল, আমি আমার নাম লেখালাম। এই চ্যালেঞ্জে দুটো লক্ষ্য স্থির করতে হয়- গোটা মাসে কত কিলোমিটার সাইকেল চালাবো আর কত ডলার তুলবো। দুটো লক্ষ্যই পূরণ করতে পারি, না করতে পারি, বা টপকে যেতেও পারি- কিন্তু কোন হার বা লজ্জা নেই; এখানে অংশগ্রহণ করার কারণেই সবাই পুরস্কৃত!

শুরু হোল আমার প্রস্তুতি নেওয়া! প্রথমেই আমার সাইকেলের সীটটা উঁচু করলাম- উচ্চতায় না বাড়লেও দ্বিতীয় বছরের অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ করায় আত্মবিশ্বাসের উচ্চতা তুঙ্গে! কিনলাম জলের বোতল রাখার বেল্ট, সাইকেলের সীটের ঢাকনা, হাতের দস্তানা- সবই অনেক দূর-দূর চালানোর কথা ভেবে! আরো কিছু জুতসই জামা-জুতোও কিনলাম। মোবাইলে ডাউনলোড করলাম 'স্ট্রাভা' অ্যাপ, যে আমার সাইকেল পরিক্রমার নিয়মিত হিসাব রাখবে। শুধু তাই নয়, তাকে যুক্ত করা হোল 'Great Cycle Challenge' এর সাথে, সব কিলোমিটারের হিসাব সরাসরি নথিভুক্ত হয়ে যাবে সেখানেও! পায়ের যত্ন নিতে শুরু করলাম- রোজ ৩০-৪০ মিনিট আমি ব্যায়াম করি। এমন যত্ন আমি নাচের জন্যও কখনো নিইনি! এবার বাইরে বেরোবার পালা। একই রাস্তায় বারবার যেতে ভালো লাগেনা- তাই কয়েকটা রাস্তা ঠিক করলাম, আর প্রতিটাতে গিয়ে হিসাব করে দেখলাম যাওয়া-আসা মিলিয়ে কত কিলোমিটার হচ্ছে! প্রথম-প্রথম দশ কিলোমিটার গন্ডির এদিক-ওদিকে চালাচ্ছিলাম; সাহস বাড়িয়ে অনেক দূর চলে গিয়ে আবার ভয় পাই- ফিরতে পারব তো? ভাবি অগত্যার গতি আবার সেই ওকেই তলব করি- আমাকে, আমার সাইকেলকে সেখান থেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাক! তারপর 'আরেকটু যাই' ভাবতে-ভাবতে দেখি বাড়ি অবধিই এসে গেছি! মে মাস থেকে অভ্যাস করছি, আস্তে-আস্তে একদিনে এখন ২০-২৫ কিলোমিটার পর্য্যন্ত চালাচ্ছি! সামনে আসছে আমার চ্যালেঞ্জ এর মাস- রণক্ষেত্রে নামার জন্য আমি মোটামুটি প্রস্তুত!

এসে গেল অগাস্ট মাস! ইতিমধ্যে জুলাই মাসে ফেসবুকে সাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে থাকা ছবিসহ নতুন আপডেট দিয়ে বন্ধুদের জানিয়েছি যে GCCর জন্য আমার অনুদান সংগ্রহ শুরু হয়ে গেছে- সরাসরি ই-ব্যাঙ্কিং মারফৎ টাকা দান করা যাবে। আমার অনুরোধে সাড়া দিয়ে প্রথম অনুদান দিল আমার এক অবাঙালী বন্ধু- কি ভীষণ আনন্দ হল! তারপর পেলাম আমার কর্তার থেকে। সাইকেল চালানোর পথটা যদি হয় আমার মনের অক্সিজেন, তাহলে এই অনুদান হচ্ছে শর্করা! অক্সিজেন আর শর্করা পুড়ে তৈরী হচ্ছে প্রাণশক্তি- সেই প্রাণশক্তি যা উজাড় করে দিয়ে আমি প্যাডলিং করব; সবার বিশ্বাস-ভরসার উপযুক্ত মর্যাদা দেব। GCC জানাল ওদের জার্সি আমি কিনতে পারি অথবা ৫০০ ডলার তুললে বিনামূল্যে পেতে পারি! কিনে নেবার অদম্য ইচ্ছাটাকে দমন করে নিজেকে আরেকটা চ্যালেঞ্জ দিলাম- দেখি কত তাড়াতাড়ি আমি $৫০০ তুলতে পারি!

পয়লা আগস্ট পড়েছে রবিবার! ওটা আবার Civic Day long weekend! বাচ্চারা জানাল ওরা ওই সময় অটোয়া আসতে চায়! এই লকডাউনের মধ্যে যতবার এসেছে, গাড়ী ভাড়া করেই, কিন্তু গ্রীষ্মের এই ব্যস্ত মরশুমে কোন গাড়ী আর পাচ্ছেনা বা পেলেও অনেক ভাড়া পড়ে যাচ্ছে। তাদের বায়না যে এবার টরন্টো গিয়ে ওদের নিয়ে আসতে হবে!

ওদের বাবা প্রথমে গাঁইগুঁই করলেও পরে রাজি হয়ে গেল! আর আমি? আমার তো বিপুল আনন্দ- এরকম দুম করে দূরে কোথাও বেড়িয়ে পড়া কার না ভালো লাগে? কিন্তু চাপটা হল যে ওই একইদিনে আমরা টরন্টো যাব, অর্থাৎ পয়লা আগস্ট! আরো আছে- আবহাওয়া পূর্বাভাস জানাচ্ছে সারাদিনই বৃষ্টি! সাইকেল চ্যালেঞ্জের প্রথম দিনটা আমার কাছে পূজোর সমতুল্য- এই দিন আমাকে সাইকেল চালাতেই হবে। সেদিন যেহেতু দুপুরেই আমাদের আবার টরন্টোর রাস্তায় বেড়িয়ে পড়া, আমি তাই সকাল নটার মধ্যে স্নান করে, কাচা কাপড় পরে তৈরী হয়ে নিলাম। ইলশেগুঁড়ির মত বৃষ্টি পড়ছিল, মাথায় হেলমেট থাকলে বেশি ভিজবনা মনে হল। বরকে ডেকে কয়েকটা ছবি তোলালাম- আমার জীবনের প্রথম চ্যালেঞ্জের প্রথম দিন বলে কথা! তারপরই সাঁ করে বেরিয়ে পড়লাম আমার রথে চড়ে। মনে মনে ঠিক করে রেখে ছিলাম প্রথমদিন সবচেয়ে সমতল রাস্তায় চালাব। Aviation parkway দিয়ে পড়লাম হেমলক রোডে, সেখান থেকে গিয়ে পড়লাম রিডো নদীর পাশে, নদীর সাথে সাথে গেলাম কিছু দূর। বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি- এত আনন্দ, উত্তেজনা শেষ কবে উপলব্ধি করেছি? রবিবারের সকাল আস্তে আস্তে জেগে উঠছে আমার চারপাশে- কফির দোকানগুলো থেকে গরম কফির গন্ধ আসছে, একটা ফুলের দোকান সবে খুলেছে, কেউ কুকুর নিয়ে হাঁটতে বেড়িয়েছে বা জগিং করছে। সবার দিকে তাকিয়ে আমি হাসি ছুঁড়ে দিচ্ছি, অন্যেরা সংক্রামিত হয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছে সেই হাসি! ইতিমধ্যে বৃষ্টি বেড়ে গেল, আমিও একটু জোরে প্যাডেল চালালাম! ভাবছি না যে কেন এই বৃষ্টি মাথায় করে বের হলাম, উলটে ভাবছি ভাগ্যিস তাড়াতাড়ি বেড়িয়েছি, অর্ধেক রাস্তা তো পেরিয়েই এলাম! বৃষ্টিতে নাচার অভিজ্ঞতা আছে, এবার সাইকেল চালানোর অভিজ্ঞতা হল। তাড়াহুড়োতে বৃষ্টির জল ভরা গর্তর মধ্যে সাইকেলের চাকা পড়ে বিশাল ঝাঁকুনি দিচ্ছে, আমি হেসে উঠছি! ম্যাক আর্থার দিয়ে বাড়ি অভিমুখে ঘুরলাম- রাস্তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে গাড়িগুলো থেকে ছিটকে আসা জল গায়ে এসে পড়ছে, তাতেও আমার ছেলেমানুষী আনন্দ! এই রাস্তাটায় সামান্য চড়াই আছে- তাড়াতাড়ি চালানোর জন্য একটু হাঁফিয়ে যাচ্ছি, মুখটা খুলে রেখেছি সেই হাসির ভঙ্গিমায়! বৃষ্টির জল আমার শিড়দাঁড়া বেয়ে নেমে শরীর, হেলমেট থেকে নেমে শুকনো মুখ ভিজিয়ে দিয়ে ক্লান্তি দূর করছে!

আগস্ট মাসের ন-দিনের মাথায় আমার ৫০০ ডলার উঠে গেল- আমার আনন্দ দেখে কে?! GCC থেকে সেদিনই মেইল পেলাম- আমার জার্সির মাপ জানিয়ে ওদের পাঠাতে হবে। মাপ পাঠানোর দুদিনের মধ্যে জার্সি এসে গেল। কি সুন্দর দেখতে- নরম, গরমে পরার উপযুক্ত কাপড়ে তৈরী নীল-কমলা রঙের হাফ-হাতা, কোমড়ের নীচ অবধি লম্বা, গলাবন্ধ কলার, পিঠের দিকে কোমরের কাছে জলের বোতল, মোবাইল রাখার তিনটে পকেটসহ জার্সিটা প্রথম দর্শনেই আমার মন কেড়ে নিল। পরে মনে হোল এ যেন অন্য আমি! পরদিনই পরে বেরলাম, সোজা চলে গেলাম ডাউনটাউনে। লোকেরা সোৎসাহে আমার দিকে তাকাচ্ছে, তাদের একটা হাসি, মাথার ঝাঁকুনি, হাতনাড়া বা হাত তুলে সাবাস দেখানোতে আমি সত্যিকারের যোদ্ধার গর্ব আর আনন্দ অনুভব করলাম! এই তো চাই- অফুরান উৎসাহ ও উদ্দীপনার উৎস হয়ে জার্সিটা এল যেন! আমার চ্যালেঞ্জের সীমা ডলার ও কিলোমিটার- দুটোই অতিক্রম করাতে নতুন করে আবার দুটো সীমা নির্দিষ্ট করলাম! ফেসবুকে সবাইকে জানালাম আমার লক্ষ্য পূরণের কথা, বললাম- 'এসো, আমার পাশে থেকে আমাকে সমর্থন কর, অনুপ্রাণিত কর!' কত কত লোকের আশাতীত সমর্থন পেয়েছি- বলে শেষ করতে পারবনা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, বিদেশ থেকে; আত্মীয়, বন্ধু, ছেলেমেয়েদের বন্ধু, প্রতিবেশি - কত লোক সাড়া দিয়েছে আমার এই উদ্যোগে, আমাকে কৃতার্থ করেছে অনুদান দিয়ে! একটা ছোট ঘটনার কথা উল্লেখ করে আমি শেষ করব কোভিডের মধ্যে আমার বিরল অভিজ্ঞতার কথা। সেই মে মাসে সাইকেল ঠিকঠাক করার পর এর মধ্যে আমি আর দোকানে দেখাতে যাইনি। মনে হচ্ছিল চাকায় হাওয়াটা কম, সাইকেল চলছে ধীর গতিতে। স্বনির্ভর দেশে সব নিজে-নিজে করার ব্যাবস্থা আছে কিন্তু আমি ভাবলাম দোকানেই যাই, সব কিছু দেখিয়ে নেব, এখনো মাসের অর্ধেক বাকি! আশা ছিল চেনা দোকানে ৫-১০ মিনিটের কাজ, আগে থাকতে কোন সময় নিতে হবেনা। ওমা, কাউন্টারের লোকটা সব বুকিং দেখে বলল, 'সামনের সপ্তাহে এসো!' আমি তো হতভম্ব, কোন দোষ লোকটাকেও দেওয়া যায়না আবার আমার এক সপ্তাহ অপেক্ষা করাও সম্ভব নয়। আমি শেষ চেষ্টা করে আমার জার্সি দেখিয়ে বললাম, 'অসম্ভব! আমি GCCর জন্য সাইকেল চালিয়ে অর্থ সংগ্রহ করছি, সাইকেল চালিয়ে দূর-দূর প্রান্তে যাচ্ছি, এর মধ্যে আমার সাইকেল খারাপ হয়ে গেলে আমি কি করব? আমি সাইকেল চালাতে ভালোবাসি কিন্তু সাইকেল সারানোর কিছু

জানিনা!' এরপর লোকটা বিনা তর্কে আমার সাইকেলটা দেখে দিল; কত কি জানতে চাইল আমার এই চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আর শেষে যখন আমি এই কাজের জন্য দাম দিতে চাইলাম, সে হাত নেড়ে বারণ করে বলল, 'Good luck and safe ride'! আমি এই প্রাপ্তির কি নাম বা মূল্য দিতে পারি? পারিনা, শুধু ধন্যবাদের হাত দুটো উঠে আসে সাইকেল এর হাতলে, জোরে চালিয়ে বেরিয়ে যাই দোকান থেকে, মনে মনে আরো অনেক কিলোমিটার চালানোর অঙ্গীকার করে! এমন অপার্থিব সুন্দর কিছু পাওয়া বা জানা হতনা যদিনা আমি এই চ্যালেঞ্জে অংশ নিতাম, যদি না পৃথিবীর বুকে মহামারী কোভিড নেমে আসত, যদি না জীবনে ছোট-ছোট, তুচ্ছ জিনিসের মুল্য বুঝে, ভালোবেসে, আনন্দ পেতে শিখতাম!

Canada's unique landmass and Canadian cold water - the Killer

Nirmal K. Sinha

Canada in my childhood radar

In 1956 when I was a 14-year old, Grade-10 high-school student in New Delhi the Suez-canal crisis in Egypt occurred. I still remember that every morning I used to combat with Pishima (my paternal aunt) to grab 'Statesman', the English-language newspaper used to be delivered at about 5 AM in the morning. My dog, Nargis (named after the famous Hindi-film actress of India) used to wake me up as soon as the paper delivery man used to open the main gate to the house. The Suez crisis struck the world after Egypt nationalized the foreign-owned Suez Canal, and France, Israel and the United Kingdom invaded Egypt to protect the financial interests of private investors. Egypt paralyzed the canal by sinking more than three dozen ships along the length of the canal. Towards the end of that year, the United Nations Emergency Force (UNEF) was established, due primarily to a proposal from the Minister of External Affairs of Canada, Lester B. Pearson and efforts by the UN Secretary-General Dag Hammarskjöld, to secure an end to the Suez Crisis. Probably that was the first time when I started to look at the map of Canada, even though I loved the Canadian author Farley Mowat through his book, "People of the deer", Pishima presented to me. Little did I know, however, that exactly five years later in 1961, I would actually travel through the Suez Canal on board the steam-ship 'Canton' of the Cunard Line, as the first leg of my sea-ward journey to San Francisco, USA via UK. I had no anticipation that I would actually meet, Canada's Prime Minister Pearson in 1963, face-to-face, in front of the national parliament building in Ottawa. Never could I imagine that in 1972, while living in a small village, Orono, Ontario, I would become a photographer/recorder of pre-1880 buildings in several counties of our area, including the town of Port Hope (where Mowat lived and resting now), on behalf of the Historic Sites and Services of the Govt. of Canada. And never could I dream about living and working among the 'people of the deer' in Baffin Island, during the late 1970's.who taught me the real-life science and engineering of sea ice – the topic I discussed with a reporter in 1995 for the Nunatsiaq News in Iqaluit, now in Nunavut.

Landscape of Canada - past and present

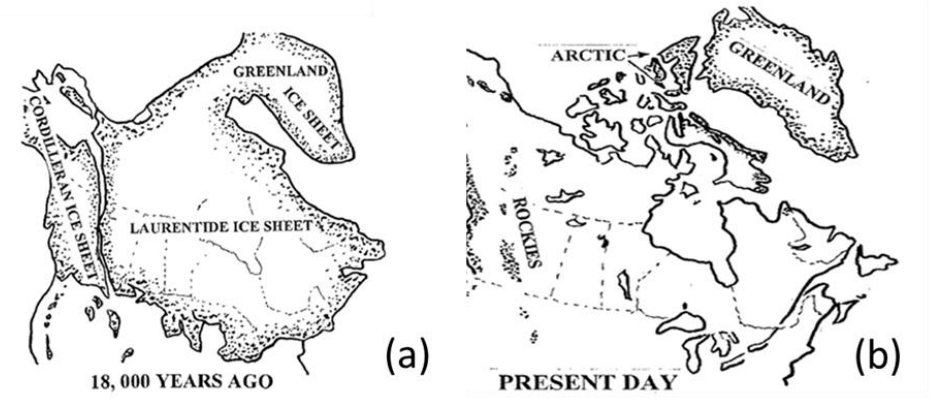

Figure 1. Schematic depiction of the upper half of North America (a) 18,000 years ago; and (b) today (Source: Nirmal K. Sinha 1999).

Today ice sheets and glaciers cover about 10% of the earth's land area. Roughly 18,000 years ago, probable peak period of the last Ice Age, much of the earth's land was covered with ice. There were three major ice sheets. They are recognized as (i) the Laurentide and western Cordilleran ice sheet, including the Innuitian and Greenland parts, (ii) the Fennoscandian and Barents-–Kara shelf ice sheets, and (iii) the Antarctic ice sheet. Relatively flat, non-mountainous areas of the northern hemisphere, such as, most of Canada and northern states of the USA in continental North America, Greenland, northern Europe, and Siberia, were covered with thick layers of ice, known generally as ice caps.

Major areas of accumulation in Canada included the Keewatin Sector, the Labrador Sector, and the Foxe-–Baffin Sector. Minor ice caps also existed in the landmasses of present-day Atlantic Provinces (New Brunswick, Prince Edward Island,

and Newfoundland) and the isolated islands in the Arctic, including Greenland. These ice caps were essentially joined together forming a huge area that was named as the Laurentide and the Greenland ice sheet as shown in Figure 1. Valleys in the western mountains in the present-day province of British Columbia and the Yukon Territories that include the Canadian Rocky Mountain (part of the Rockies in the USA) were full of ice forming the Cordilleran ice sheet. The maximum ice thickness of the Laurentide ice sheet was probably around 4 km; that of the Cordilleran ice sheet may have been close to 2 km.

As a result of Global Warming, the ice sheets melted, raising the sea level and developing the river systems in North America. Most of the glacial landforms seen today across Canada and northern states of the USA were formed through these processes. The ice cover receded relatively rapidly. Most of the ice from the landscape of the North America, including Canada of today, was gone by 5,000 years ago, except for Greenland and a few ice caps. It is during this postglacial period that people from Asia moved in along with other flora and the fauna from the south. Erosion due to seasonal snow fall and melt, rain, and wind modified the glacial landforms with the passage of time. However, these changes in the landscape of Canada and the USA were not significant except for the forestation, and development of grass lands. The glacial landscape including two million fresh-water lakes (in Canada) was essentially preserved and will probably survive for thousands of years to come. If, however, all the remaining ice sheets on Earth's crust melt due to continued global warming, then the sea level will rise and low-elevation land areas like the state of West Bengal of India and Bangladesh, and most coastal cities of the world will be under water, as depicted in Figure 2.

……

Figure 2. Conceptual image drawn by Nirmal K. Sinha in 1989

Canadian lakes - the biggest reservoir of freshwater

Look at the map of Canada and the northern states of the USA bordering Canada. It is extremely difficult to contemplate that with more than 560 lakes larger than 100 km^2 in surface area, Canada has more freshwater lake area than any other country in the world. Although there is no official estimate of the exact number of all the lakes in this country, but with about two million lakes representing about 20 per cent of the Earth's freshwater, Canadians have an incredible abundance of clear water and aquatic natural assets to enjoy. Presently for every 20 persons in Canada, there is one lake to share.

Now let us look at the physical size of the major lakes in Canada. Lake Superior with a surface area of 82,100 km^2 is the largest freshwater lake not only in North America, but the whole world. As a person of South-Asian origin, I always tend to compare the size of Canadian lakes with countries in South Asia, consisting India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Maldives, etc. No traces will be found if Sri Lanka, with an area of 65,600 km^2, is placed in the middle of Lake Superior. In fact, a greater section of Sri Lanka can also be immersed in Lake Huron (Area: 59,600 km^2) and Lake Michigan (Area: 58,030 km^2), two other members of the 5 Great Lakes in North America along with Lake Erie (25,740 km^2)

and Lake Ontario (18,960 km^2). Even Lake Ontario, the smallest of the 5 Great Lakes of North America may actually appear to be an open ocean to most South-Asian immigrants, making greater Toronto area as their home. Of course there is a tendency to emphasize Great Lakes of North America without even mentioning fully Canadian, Lake Winnipeg (Area: 24,510 km^2) and Great Slave Lake (Area: 27,200 km^2), both of which are larger than Lake Ontario. And we hardly hear any things about Lake Athabasca (Area: 7,850 km^2), Reindeer Lake (Area: 6,500 km^2) and innumerable medium-sized lakes well within the Canadian landscape.

The total surface area of the 5 Great Lakes, Lake Winnipeg and Great Slave Lake is about 296,150 km^2. This is sufficient to drown both the countries of Bangladesh (148,560 km^2) and Nepal (147,500km^2). It is, therefore, incredible to think about the size of freshwater reservoirs in Canada.

Surprise, surprise!!

Due to complex processes of deglaciation and post-glacial uplifting of the land depressed during the glacial period, Canada's landscape is unique. There are some amazing surprises in the water-quality of lakes in this vast country.

Examples of salt-water lakes are Manitou Lake near the Saskatchewan-Alberta border, north-west of Saskatoon and the popular Little Manitou Lake well inside the province of Saskatchewan which boasts over 100,000 lakes. Little Manitou Lake, about 116 km south-east of the city of Saskatoon, is 19 km long and about 1 km wide, and parts of it is nearly six meters deep. The location is excellent for day-trippers of Regina and Saskatoon. Actually, it is located halfway between Regina and Saskatoon. Manitou Springs Resort & Mineral Spa claims to have the largest indoor mineral pool in Canada. The water is high in sodium, magnesium and potassium salts. Canadians, therefore, don't have to make trips to distant countries for self-healing water immersion therapeutic adventures. There is a saying – Little Manitou refuses to let anyone drown in it. This small lake has a mineral density of about 170 ppt (parts per thousand) or about four-times saltier than most ocean water with salinity close to 35 ppt. The dissolved salt enables swimmers to effortlessly float on their backs. However, that's not the case with most water bodies in Canada. Buoyancy effects of clean freshwater is significantly less than brackish or sea water. Drowning accidents are common in this country and around the whole world.

The World Health Organization (WHO) reports drowning is among the top causes of death for children worldwide. Teaching school-age children basic swimming, water safety and safe rescue skills is one of the Ten Actions to Prevent Drowning specifically identified by the WHO report. Lifesaving Society of Canada (LSC) concluded that with some 450-500 fatalities annually, drowning is the third leading cause of unintentional death among Canadians under 60 years of age (surpassed only by motor vehicle collisions and poisoning). About 160 people drown every year in Ontario. As for children 1-4 years of age, drowning has become the No. 1 cause of unintentional injury deaths, and the second leading cause of preventable death for children under10 years. "All children should learn to swim" is the motto of Lifesaving Society. Programs like Lifesaving Society's "Swim to Survive" instruction could have immunization-like benefits. I will discuss this topic later in greater depth.

Canada is the land of immigrants. The human occupation of this vast land, as mentioned earlier, started perhaps about 5,000 years ago. North Asians were certainly the first new comers. Then mass migration occurred from different countries in Europe. People from the east and south of Asia are among the latest immigrants. They are generally expected to be used to warm waters of ponds, lakes, rivers and the oceans. But, that's not the case with most new immigrants who are mostly dwellers in crowded cities without access to open-water bodies and little knowledge of the country sides. They may think that clean water comes only from the taps.

Immigrants from South Asia

People from the South Asia, I know so well, come with a diverse background from wide-ranging landscape consisting tree-less hot and dry arid lands or deserts to dense forests with high mountains, high humidity and incessant rain.

Nepal, for example, lying along the southern slopes of the Himalayan mountain ranges, is a landlocked country with an area of about 147,500km^2. It is rectangular in shape, extending about 800 km from east to west and average width of roughly 185 km from north to south. Nepal's geography is unique. Roughly 75% of this nation is covered by mountains containing some of the most rugged and difficult mountainous landscape in the world. It includes fertile plains, subalpine forested hills, and most importantly, eight of the world's ten tallest mountains, including the highest point on Earth, Sagarmāthā (Mount Everest). *Sagarmāthā* is a Nepali word derived from 'sagar' meaning "sky" and 'māthā' meaning "head". Compare Nepal's landscape with that of original Bengal consisting West Bengal, a state of India, and Bangladesh of today.

Bengal, the largest flat delta land of the world containing fertile clay-rich and silty soil (called polimatti in Bangla) coming down from the Himalayan mountain range. Bangladesh with an area of about 148,560 km^2 (similar to Nepal) extends to a length of about 800km (also comparable to Nepal) from the north along the foothills of the Himalaya to Bay of Bengal in the

south. Unlike Nepal, Bangladesh is very flat, except for very small hilly areas, and gets submersed in water during the peak period of every monsoon. Bengal's Ganga/Padma (the Ganges), Meghna and Jamuna (parts of Brahmaputra) rivers create fertile plains, and travel by boat is common. On the southern coast, the Sundarbans, an enormous mangrove forest is home to the royal Bengal tiger.

As a child at the edge of a small town, Naogaon (in Rajshahi district of Bengal, India; now in Bangladesh) the only exposure to rocks I had was the marble plates, bowls and glasses in our Lakshmi-ghar (Puja-ghar or family temple), detached from the main building and facing towards the Himalaya in the north. My Karta-ma (paternal grandma) used to decorate the offerings of flowers and fruit on marble plates to the multitude of marble, brass and sandal-wood carvings or images (Moorty - metaphor for nature of things) during the daily puja times. I was free to play with the figurines as toys as long as I stayed within the room. She used treat me as the living Bala(child)-Krishna. Every morning Kartama and I used to go to our bathing-ghat of Little-Jamuna River beside our house and bring back a little brass-pitcher full of water for the Puja ceremony. She taught me to swim in the river ever since I was a toddler. It may sound strange that I did not witness any real-life natural rocks until I was sent to Delhi when I was eight years of age. Delhi developed beside Yamuna River over many centuries. The great Yamuna River (associated with the love-stories of Lord Krishna) is the source of water for the entire city of today's New Delhi where I grew up. But, I never swam in Yamuna (Jamuna in Bangla).

An incident to remember

Back in Naogaon, my closest pre-nine friend was Nitu (or Nitoo). We were inseparable. Everybody used to call us Nitai-Nimai; my short name being Nimu (or Nimoo). Of course, Nitai-Nimai has rather divine attributes in every Bangali minds, as two famous devotees of Krishna.

Nitu started to attend a school, but my father (Baba) decided to provide home-schooling for me, in order (I believed) to separate us during the school hours. Baba thought we will not do any study at school. Perhaps there were some truths in that thinking. He used to teach me in the morning and again the evening – between his working hours in a bank. I used to be free during most of the day-time except for the lunch-hour with Kartama. She along with my Ma and Kakima (wife of my only uncle) used to take naps. I used to sneak out to explore the edge of the forest, north of our house and beside the river, and anxiously wait for Nitu's home-coming, six days a week (Only Sundays used to be the holidays).

One afternoon Nitu and I were having a swimming competition, as usual, after his return from the school. We noticed a strange object floating in the middle of the river along with a bunch of water hyacinth plants (Kochuripana). Naturally that became our target. Both of us touched the object almost at the same instance. Nobody was around in the area. It turned out to be a blown-up body of a child. Soon after coming back to the shore we screamed and screamed - and the adults recovered the body. The drowning occurred upstream in a tiny village far away and the villagers couldn't recover the body. It was the monsoon season and the river was almost over flowing. Both Nitu and I were only about 8.5 years old. Incidentally, soon after this occurrence and for entirely different circumstances, I eventually ended up in New Delhi, but the trauma remained with me.

Ice – the Killer

Many years ago, I got involved with the Lifesavings Society of Canada on the very topic of drowning and water-related accidents in this country, coast-to-coast - that goes beyond any colour-barrier of the skin and touches old as well as new comers of this nation of immigrants. The geography and natural conditions, particularly the presence of cold water bodies across this country are significantly different from the waters of most places in the world, especially the tropical countries. **Hypothermia** can set in very quickly even for a good swimmer. Presence of snow and ice for a major part of the year makes all the differences. Wide-ranging information is available in the resource book, "Ice - the Killer", published by the Lifesaving Society of Canada (Figure 3).

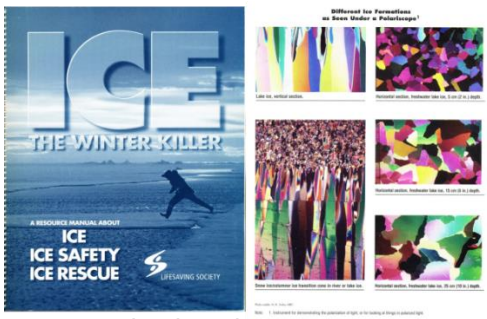

Figure 3. ICE- the Winter Killer, a resource book on ice, ice safety and ice rescue, published by the Lifesaving Society of Canada, 1998

What is hypothermia? It is the medical term for a condition that can develop after a person has fallen into cold water or has been exposed to cold air temperature. It occurs when the amount of heat produced by the body is less than the amount of heat that is lost to the environment – that is, air or the water. The net loss of heat in the body results in a lowering of the body's core (heart and brain) temperature, T_C. Although there are many definitions and classifications, the clinical definition of hypothermia is a T_C of 35°C or lower, but lowering of the T_C below normal levels (around 37°C) may result in the body becoming hypothermic. The Wilderness Medical Society Practice Guidelines (1995) classify hypothermia as mild at T_C >32°C or profound at T_C < 32°C. Lifesaving Society of Canada tends to describe these two classifications as mild-to-moderate and severe. Hypothermia can eventually lead to death if not immediately recognized and treated.

It's generally believed in Canada (keeping aside the new immigrants) that you can develop hypothermia only in the winter. This cannot be further from the reality. Contrary to popular belief, you can become hypothermic not only in the winter, but also in the spring, summer and fall depending on the prevailing weather conditions, the thermal state of the water and physical circumstances of the person in the water – 'immersed' with the head out of the water or 'submersed' implying that the head is underwater. Depending on locations, the temperature of the water and the stratification of temperature in the water mass depend on the size, shape and depth of the lakes. The air temperature may be very warm and the water surface temperature near the shorelines may feel tolerable, but the water temperature below the surface levels only a few meters away can still be cold (i.e., below 20°C) in the spring and fall. In winter, we know that both the air and water are cold, so we dress accordingly. However, in the spring and fall, people may often be wearing only shorts and a T-shirt, so if they fall into or try to swim in the cold water the risk of hypothermia is increased.

It is extremely important to know the facts of water, and of course ice, to prevent water- or ice-related tragedies. Almost all of Canada's lakes, streams (creeks), rivers and oceans are cold year-round. Cold water drownings and hypothermia can happen at any time of the year and anywhere in this second-largest country in the world. It is generally believed that hypothermia can occur when water temperature is very low, but it can also occur following a relatively short period in the water, even at temperatures as high as 20°C.

South-Asian and Asian communities usually shy away from outdoor winter activities. After coming to Canada, most of the new (as well as the old) immigrants of Asian and South-Asian background stay indoors during the winter months. Clean lakes attract new immigrants in a very special way because most of them are used to warm fresh-water ponds (not necessarily deep lakes) and rivers. They venture out as soon as the spring arrives without any preparation, unaware of the dangers of the beautiful, but cold lakes and rivers. They eagerly wait for the spring and the summer activities. They may not be aware of the water-related issues of this land due to exposure to cold environments (air and water) and hypothermia. They go out for camping or adventuring in the cottage countries without any relevant preparations and/or training. Even a good swimmer, back in their home countries, may not last long in the open-water in Canada due to thermodynamic states of the water bodies in this country. Non-swimmers have no chance at all. But help is at their fingertips and available readily from the Lifesavings Society of Canada. Drowning-related incidents and accidents are preventable (**visit www.lifesavingsociety.com for details or contact Barbara Byers, Senior Research Officer, Lifesaving Society of Canada, email: barbarab@lifeguarding.com**).

All of us should learn how to prevent drownings in aquatic environments. Do not just be a bystander or even a 'lay rescuer', without any experience or required training, who could actually endanger their own life. The Lifesaving Society's slogan is: "All children should learn to swim. We can teach them". The society supports the classification of basic instruction in swimming skills, lifesaving skills for self and others, and CPR skills as an essential service. Recently, the Lifesaving Society also has created 5 different double-sided 10cm x 23cm Water Smart Tip cards (two shown in Figure 4) with key messages for:

- Cold Water Safety: emphasizing wearing of lifejacket, preparedness and survival mode
- Choosing Lifejackets and PFDs: for children and youth/adult, and wearing them at all times
- Parents of Children under 5 years: highlighting on keeping eyes on them at all times
- Parents of Children 5-12 years: stressing every child be enrolled for swimming lessons
- Parents – Watch me not your Phone; don't be distracted parents, keep your phone down

Figure 4. Examples of two sets (out of five) of messages in Lifesaving Society's 'Water Smart Tip' cards

Useful contact information

1. Drowning Prevention Research Centre is the lead agency for drowning and water-incident research in Canada. Tel: 416-490-8844 Email: experts@drowningresearch.ca

2. Lifesaving Society Ontario, 400 Consumers Rd., Toronto, Ontario, M2J 1P8 Tel: 416-490-8844 Fax: 416-490-8766; Email: experts@lifeguarding.com ; Web: www.lifesavingsociety.com

Editor's Note: Recently, a drowning accident in our community has left all of us shocked and heart-broken. This informative article was an emotional and intellectual reaction to this unfortunate event, to remind everyone that most such incidents are preventable.

গোলেমালে গোল

আদিত্য চক্রবর্তী

(এ বছরের লেখা, আদিত্য শেষ করতে পারেনি। তাই আমরা যেটুকু লেখা হয়েছিল, সেই টুকুই লিপিকাতে প্রকাশ করছি। আর আদিত্যর অভাব ও আমাদের প্রস্তুতির অভাবে 'লিপিকা'তে এবারে হয়তো অনেক ভুল-ত্রুটী থাকবে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।)

যে গল্পের নামই শুরু হচ্ছে গোলেমালে গোল দিয়ে—সেই গল্প কোথায় যে যাবে কিছুই জানিনা। কিছু একটা লিপিকার জন্য লিখতে হবে তাই এর চেয়ে ভাল নাম মাথায় এলোনা। সবই তো গোল—এই পৃথিবীটা গোল। আমার আপনার চিন্তাধারাও তো গোল। তাল ওতো গোল। অনেকের পা ও তো গোল। অবশ্য গোল না হয়ে চার চৌকো হলে বা ত্রিকোণ হলে খুবই সমস্যা।

অতদূর ভাবিনি অবশ্যই। হলে কি যে হতো কে জানে। যানবাহনের অবশ্যই বেশ সমস্যাই হতো। তিন কোণা চাকার গরুর গাড়ী হলে একটু চিন্তা করে দেখুন। এই ভাবনাটা আমি আপনাদের উপরেই ছেড়ে দিলাম। মাথায় গোল গোল করেই অবশ্য চিন্তা করবেন। নাহলে যেখান থেকে চিন্তা করা শুরু করেছিলেন সেখানে কিছুতেই ফিরে আসতে পারবেননা। আর সেটা না করতে পারলে আপনার পা ও গোল হয়ে যেতে পারে।

ফলের জগতের কথা তো বলাই হয়নি। সেখানে কলা ছাড়া তো দেখি সবই গোল—তাল ও গোল। তরমুজ, আপেল, লিচু, কমলালেবু গোল। কাঁঠাল কে অবশ্য ফলের রাজ্য থেকে বাদ দিতে পারেন তার আকারের জন্য।তবে কাঁঠালের একটা দিক তো গোলই বটে। ঠিক আছে। আপনাদের ওপর ছেড়ে দিলাম কাঁঠালের বিচার করতে। যা ঠিক করবেন তাই মেনে নেব। বেশী ভাববেন না কিন্তু। নয়তো যা বলেছি—পা টাও গোল হয়ে যেতে পারে কিন্তু আপনার। আমার মাথাটাও তো গোল! তাহলে সমস্যা কোথায়? ভাবুন!

ছোটবেলায় ভাগলপুরে ঘুড়ি ওড়ানোর আর অন্য ঘুড়ির সঙ্গে প্যাঁচ লড়াইতে প্রচণ্ড নেশা ছিল। দিশেহারা হয়ে শীতকালে হন্যে হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতাম। সেই যে ঘুড়িতে লাট খাওয়ানো, প্যাঁচ খেলা---মনে করলেই প্রাণটা একেবারে হুহু করে ওঠে। এখানেও ঘুড়ি উড়ান চালু। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে। ঘুড়িগুলোতে কেমন যেন প্রাণ নেই। সোজা আকাশে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পাক ও খায়না—চুপচাপ বোকার মতন সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রাণহীন একটা বস্তু।

সেই তুলনায় ভাগলপুরের ঘুড়ি একটা প্রাণবন্ত জিনিষ। বাঁয়ে ঘুরতে বললে বাঁয়ে ঘোরে - ডানদিকে ঘুরতে বললে তাই করে। আর পাক দিতে বললে ঘুড়ির কি আনন্দ! বনবন করে ঘুরতে থাকে।

(এতটুকুই লেখা হয়েছিল।)

গোল নিয়ে গোলমাল গোলাকার

আদিত্য চক্রবর্ত্তী (২০১৯ খৃষ্টাব্দের লিপিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল)

এই গোল নিয়েই গোলাকার ভূগোলে যত গোল। কোথাও কোন গোল দেখলেই শুরু হয়ে যায় যত গোলমাল। মাছের বাজারে, বাসের মধ্যে, বাজারের মাঝারে কারুর একটু পা মাড়িয়ে দিন বা কারুর সুন্দরী বউএর দিকে একবার গোল গোল চোখে তাকান তারপরে দেখবেন কেমন সবাই আপনাকে গোল করে ঘিরে গোলমাল শুরু করে দেয়! গোল গোল মাশুলওয়ালা হাত দিয়ে লম্বা আপনাকে তুলোধূনো করে কেমন গোলাকার করে দেবে! অবশ্য গোলাকার না করে ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজও করে দিতে পারে। সেটা হলে কিন্তু একটু অসুবিধা আছে। গোল হলে গোলগোল করে গড়গড়িয়ে বাড়ি যেতে পারেন কিন্তু অন্যরকম কিছু হলে কোন মতেই সেটা সম্ভব নয় বলেই আমার ধারণা। সে ক্ষেত্রে গোল গোল চাকাবাহিত হয়েই হাসপাতালে যেতে হবে আপনাকে।

ছোটবেলায় পরীক্ষার খাতায় গোল গোল শূন্য যোগাড় করায় আমি বেশ দক্ষ ছিলাম। বাবার কাছে সব সময়েই শুনতাম – আবার গোল—ঘাস কাটা ছাড়া আর কিছু হবেনা তোর। তোকে গোল থেকে মুক্তি দিতে পারে এমন কাকে পাই বলতো, হতচ্ছাড়া ছেলে!

হঠাৎ মনে পড়ে গেল কোথায় যেন শুনেছি বা হয়তো দেখেও থাকতে পারি সেই গোলের গোলমাল নিয়ে ছড়া। ঠিক মনে পড়ছে না, সবই গন্ডগোল আমার এই গোলাকার মাথার মধ্যে। যাই , শুনুন তবে সেই ছড়া এবার।

গোল গোল আঁখি করি গদাধর গায়
গোলমরিচের সাথে আদাগোলা খায়।
গোল গোল চেহারার গোঁয়ার গোয়াল
গোশালা হইতে আসি করে নাজেহাল।
রসগোল্লা খায় বলি অঙ্কে পায় গোল
বলে ওটা হয়ে গেছে গোলে হরিবোল।
ঘুমঘোরে লাথি মারি বলে দিনু গোল
ছোটভাই জেগে উঠে করে বড় গোল।
গোলদীঘি মাঝে যদি কাটহ সাঁতার
গোলোকে আসন পাবে কহি বারবার।

আমার গোল মাথায় সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তাই বাকীটা অন্যসময়।

আমার গুরু অথ শিব্রাম চকরবরতি কথিত – গোবর্ধন মানে স্বনামধন্য হর্ষবর্ধনের ছোট ভাই রসগোল্লার হাঁড়ি থেকে রসগোল্লা মুখে দিয়ে বলে যে সে গোল্লায় যাবেনা বরং গোল্লাই তার মধ্যে যাবে। কি যে গোলমেলে কথা! আরেকটা বলি শুনুন। কানাই-বলাই দুই ভাই – কানাই বিয়ে করলো, তখন বলাই বাহুল্য। আবার একজনের নাম তারক পাল। ভোটার লিস্টে তার নাম হল “তার কপাল”।

গোলের জট ছাড়াতে কোথা থেকে যে কোথায় যাচ্ছি।

সেই এক বুড়ি ঠাকুমার গল্প যে কিনা বাজী ধরে এবং জিতে গিয়ে প্রচুর পয়সা করে। এই তো কদিন আগে সেই ঠাকুমা পৌঁছে গেলেন সেই শহরের এক বড় ব্যাংকের ম্যানেজারের ঘরে। উদ্দেশ্য টাকা জমা দেওয়া। কত টাকা জিজ্ঞাসা করায় খুবই কিন্তু কিন্তু করে বললেন এই সামান্য দশ লাখ মত। ম্যানেজার খুশি হয়ে বললেন কোন অসুবিধে নেই – তো আপনি করেন কি? – এই খেলাধূলো বা যে কোন জিনিস নিয়ে বাজী ধরি। এই যেমন ধর ম্যানেজারবাবু তুমি পরচুলা পরেছ।

-মোটেই না।

-ঠিক আছে – এক লাখ টাকার বাজী। কাল সকাল এগারটার সময় আমি আসব এর ফয়সালা করতে।

ম্যানেজার তো খুব খুশী বেশ বিনা পরিশ্রমেই টাকা রোজগার হবে বলে। পরদিন ঠাকুমা এলেন উকিলকে সঙ্গে নিয়ে। এক্কেবারে পাকা কাজ উকিল সাক্ষী রেখে।

-আমি কিন্তু তোমার চুল টেনে দেখব।

ম্যানেজার রাজী। তখন ঠাকুমা ম্যানেজারের চুল টানলেন, ম্যানেজার ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল আর অন্যদিকে উকিলবাবু কাঁদতে কাঁদতে দেওয়ালে মাথ ঠুকতে লাগলেন। এসব দেখেশুনে ম্যানেজার বলল যে উকিলবাবু ওরকম করছেন কেন।

-আরে আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেল। আমার সঙ্গে ঠাকুমা বাজি ধরল পাঁচ লাখ টাকার কিনা এই ব্যংকের ম্যানেজারের চুল ধরে টানবে। এখন আমি চুল ছিঁড়ব নাতো কি করব?

মাঝখান থেকে এই গোলমেলে বাজি ধরে আমাদের এই বুড়ি ঠাকুমা চার লাখ টাকা জিতে গেলেন।

এইবার বলি দুই গুলিখোরের সত্যি গল্প। তো তারা আফিং খেয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছে। একজনের হাতে টর্চ। সে একটা বাড়ির ছাদের দিকে আলো ফেলে অন্যজনকে বলল - তুই এই আলো বেয়ে উপরে উঠে যেতে পারবি? সেই বন্ধু হাহা করে হেসে বলল – অত নেশা হয়নি যে এই চালে ভুলব। আমি উপরে উঠতে শুরু করি আর তুই দুম করে আলো নিবিয়ে দে। তখন আমি পড়ে হাতপা ভাঙব না!

আজ আমার গোল করা কথার শেষ। এখন আমার কি অবস্থা জানেন তো – ভূগোলেতে গোলমাল ইতিহাস পড়ে আমি হয়েছি পাগল!!!

*****

খাই খাই বিচ্ছু

আর. কে. নারায়ণ-(মূল গল্প-The Hungry Child)

অনুবাদ-সংঘমিত্রা চক্রবর্তী

লেখক পরিচিতি - আর. কে. নারায়ণের জন্ম ১৯০৬ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে। ইংরিজি ভাষায় লেখা প্রথম ভারতীয় সাহিত্যিকদের অন্যতম তিনি। অন্যরা হলেন মুলক্ রাজ আনন্দ, রাজা রাও প্রমুখ। তাঁর ছোটগল্পগুলির পটভূমি দক্ষিণ ভারতের একটি কাল্পনিক শহর মালগুডি। বর্তমান গল্পটি তাঁর Malgudi days নামক বইটি থেকে নেওয়া হয়েছে।আর. কে. নারায়ণের মৃত্যু ২০০১ সালে চেন্নাইতে।

পুরনো খেলার মাঠে মেলা বসেছে। মাঠটা লেভেল ক্রসিং উজিয়ে। মেলার আয়োজক স্থানীয় পৌরসভা। একটা গালভারী নামও দিয়েছে তারা।এক্সপো ৭৭-৭৮। মাঠটা ঘিরে লাইন করে ছাউনি দেওয়া দোকানঘরের সারি। সারি দেওয়া দোকানগুলির মাঝখান চিরে তৈরী হয়েছে ইঁট বাঁধানো রাস্তা।আলোর বান ডেকেছে যেন সেখানে।মেলা বাবদে ভারী উদ্যোগী পৌরসভাটি। পয়সাকড়ির আমদানী নেহাৎ মন্দ হয়না। পৌরসভার কথানুযায়ী এক্সপোতে তুমি যা চাও সব পাবে-আলপিন থেকে মোটরগাড়ি অবধি।অবশ্য একটি মাত্রই যন্ত্রচালিত শকট দৃশ্যমান সেখানে। উনিশশো ত্রিশ সালের মডেলের একটা ফোর্ডগাড়ি মহা আড়ম্বর সহকারে সাজানো রয়েছে একটা রংচঙে শামিয়ানার নীচে। চাঁদোয়ার চারধারে লাল নীল বাল্বের মালা। কাপড়ের ফেষ্টুনে বড়বড় করে লেখা, যার টিকিটের নম্বরের সঙ্গে লাকি নম্বর মিলে যাবে তার ভাগ্যে এই মহামূল্যবান গাড়িটি ঝুলছে। মেলাগামী বিশেষ বাসগুলি সারাদিন ধরে মার্কেট রোড থেকে আসা গাদাখানিক লোকদের উগরে দিচ্ছে এক্সপোর বিশাল ধনুকাকৃতি গেটটার সামনে।দু এক গজ অন্তর অন্তর উঁচু বাঁশের খুঁটিতে লাউডস্পিকার লাগানো। সেখান থেকে তারস্বরে বাজছে বিজ্ঞাপনী প্রচার আর ফিল্মি গান। পেছনে যোগ্য সঙ্গত দান করছে জনতার অন্তহীন কোলাহল।এক্সপোর উদ্যোক্তারা মেলা প্রাঙ্গনটিকে বেশ একটি ঝলমলে আলোয় উদ্ভাসিত, কর্ণপটহবিদারী আওয়াজে পরিপূর্ণ, অপরিমিত ধূলো ও আবর্জনা সমন্বিত ক্ষুদ্র জগতে পরিণত করার দক্ষতা প্রর্দশন করতে সক্ষম হয়েছেন।

কি কুক্ষণে যে মেলায় আসার ভিমরতি হয়েছিল রামনের! বিভিন্নরকমের আওয়াজে কান ফেটে যাওয়ার জোগাড়। ভীড়ের ঠেলা খেতে খেতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। কি ভালোই না হতো যদি কানের ওপরে একটা ঢাকনা লাগানো থাকতো! আওয়াজ হলেই তৎক্ষণাৎ ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করা যেত কানদুটোকে। তখন তাহলে শার্দূল লাঞ্ছিত অর্ন্তবাসের গগনবিদারী বিজ্ঞাপনী প্রচার আর অসংস্কৃত ছায়াছবির ততোধিক অসংস্কৃত গানের খপ্পর থেকে কানবাবাজী একটু রেহাই পেত। তিতিবিরক্ত রামন ভাবতে বসলো, 'একঘেয়েমী থেকে বাঁচতে মেলায় এলাম আর এ যে দেখি নরক গুলজার'। রামন আপশোষ করতে লাগলো অত দূরের এলামান স্ট্রিট থেকে এই হট্টমেলায় আসার জন্য। আবার ঠিক এই মাদকতা মেশানো ভীড় ছেড়ে যেতেও তার পা সরলোনা। একধরণের উন্মাদনায় ভরা এই জনস্রোত,এই উচ্ছৃঙখল জনতার কলরব তাকে যেন একটু মানসিক আরাম দিল যেটা তার তার এখনকার পরিস্থিতির পক্ষে খুবই জরুরী ছিল। ও ভীড়ের মধ্যে গা ভাসিয়ে এলোমেলো ঘুরতে লাগলো।মাঝেমাঝে তার পেশাদারী ও সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী মেলার স্টলগুলির মাথায় লাগানো সাইনবোর্ডের ওপর না পড়ে পারলোনা। একটা সাইনবোর্ড খুবই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।একটা বড়োসড়ো প্ল্যাকার্ডে একটি মেয়ের ছবি। মেয়েটির কোমর থেকে পায়ের পাতা অবধি মৎস্যাকৃতি। রূপকথার গল্পে যাকে মৎস্যকন্যা বলে মেয়েটি তাই। রামন মনে মনে আলোচনা করতে লাগলো ও যদি ছবিটা আঁকার বরাত পেত তাহলে কি ভাবে মৎস্যকন্যার নকশাটার খসড়া করতো। অন্য সাইনবোর্ডগুলিতেও আরেকটু রুচির পরশ বুলিয়ে মেলাটিকে আরো খানিকটা সুষমামণ্ডিত করা যেত আর কিঞ্চিৎ অর্থাগম ও হতো তার। কিন্তু তার এখন একটা ঊষর সময় যাচ্ছে। কাজকর্ম কিছুই ভালো লাগছেনা। কতদিন হলো সে তার কারখানায় যায়না।এতে অবশ্য মার্কেট গেটের তার চির প্রতিদ্বন্দ্বী জয়রাজ মহাখুশী। 'কামাক টাকা যত ইচ্ছে, যদিও ওর শৈল্পিক চেতনা একটা মর্কটের

চেয়ে বেশী নয়'। একটা বিশাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবলো রামন। তারপর যুগপৎ বিরক্তি আর মুগ্ধতা সমন্বিত দৃষ্টিতে খানিক তাকিয়ে রইলো মৎস্যনারীটির প্রতিকৃতির দিকে। ইত্যবসরে প্রদর্শনীটির মালিক একটা কাঠের পাটাতনে চড়ে তারস্বরে চেঁচাতে লেগেছে। 'আসুন,আসুন, তাড়াতাড়ি। এই মহার্ঘ সুযোগ হেলায় হারাবেননা। অপার্থিব মাধুরীমণ্ডিত এক স্বর্গীয় মৎস্যকন্যা কেমন করে জলে অধিষ্ঠান করছেন সেই দুর্লভ দেবোপম দৃশ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেননা। আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তরও তিনি দেবেন। পা চালিয়ে আসুন দেরী না করে'।

'কি প্রশ্ন'? রামন নিজেকেই জিজ্ঞেস করলো। ওকি অসামান্যা মৎস্য-রমনীটির কাছে এই প্রশ্ন রাখতে পারে সারাদিনমান জলে বসে থেকেও কি উপায়ে তিনি সর্দির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করেন বা কি ধরণের বস্ত্র তাঁর শল্কাবৃত দেহবল্লরীর পক্ষে উপযোগী? এইভাবে যখন সে মনে মনে আন্দোলিত হচ্ছে ঐ রমনীরত্নটির কাছে যাবে কি যাবেনা তার প্রশ্নাবলী সমেত, সেই সময় মেলার হৈ হট্টগোলের মধ্য দিয়ে একটা ঘোষণা তার শ্রুতিগোচর হলো। 'একটি পাঁচ বছরের ছেলে, নিজের নাম বলছে গোপু, বাবা, মাকে হারিয়ে ফেলেছে। খুব কান্নাকাটি করছে। বাচ্চাটির বাবা মা শীঘ্র আমাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসে ওকে নিয়ে যান'। উপর্যুপরি চারবার চিৎকৃত হলো ঘোষণাটি। ঘোষণাটি যেন এক লহমায় রামনকে মৎস্যনারীটির মোহপাশ থেকে মুক্তি দিলো। তার এখন লক্ষ্য স্থির। সে এখন যাবে মেলা অফিসে বাচ্চাটিকে স্বচক্ষে দেখতে। 'একবার তো দেখতেই হচ্ছে কি ধরণের বাচ্চারা হারায়। বাবা মা রাও বা এতটা আহাম্মক হয় কিভাবে যে বাচ্চা হারিয়ে ফেলে নাকি ওরা ইচ্ছে করে ফেলে আসে'? এইরকম নানা প্রশ্ন মাথায় গুঁজে রামন ধাবিত হলো মেলা অফিস অভিমুখে। সামনে বহু লোক ভীড় জমিয়েছে একটা মানব অঙ্গ প্রর্দশনীর গেটের কাছে। নাকি ভেতরে কাঁচের জারে রাখা আছে মানুষের কিডনি, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও একটি ভ্রূণ পর্যন্ত। সর্বোপরি রয়েছে একজন জীবন্ত মানুষের পুরো শরীরের এক্সরে। তামাশা দেখতে উপচে পড়েছে জনতা। সেই জমায়েত চিরে ছুট লাগালো রামন।

মেলার সুরকি ফেলা রাস্তা দিয়ে ধাবমান রামনের চোখে পড়ল একজন লোক চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাকড়শার জালের মতো সরু সরু চিনির সূতো দিয়ে রং বেরঙের চিনির বল বানাচ্ছে। হাল্কা কিন্তু মস্ত বড়। রামনের খুব সাধ জাগলো ঐগুলি খাওয়ার। কিনেও ফেললো একটা। কিন্তু খেতে গিয়ে দেখলো পুরো মুখটাই ঢেকে যাচ্ছে। লজ্জাও করতে লাগলো একটু। একটা ধেড়ে লোক লাল, নীল চিনির গোলা চুষছে। লোকে কি বলবে। সে তখন এমন কায়দা করে চিনির গোলাটা ধরলো যেন মনে হয় সে অন্য কারোর জন্য ওটা নিয়ে যাচ্ছে তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে সুযোগ বুঝে আমেজ ভরে মাঝে মাঝে একটা দুটো কামড় বসাতে লাগলো। 'আহা কি স্বাদ!' চাটতে চাটতে ভাবলো রামন। তারপর মুখের চারদিকে চিনির লম্বা লম্বা সূতো ঝুলিয়ে আর চিনির ক্যাণ্ডিটা ডানহাতে ফুলের তোড়ার মত ধরে সে পদার্পণ করলো মেলা কমিটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। মেলা অফিসটি এক্সপোর দক্ষিণ দিকে। রামন সেখানে ঢুকে দেখলো কয়েকজন টাইপিস্ট ঝড়ের বেগে টাইপ করছে আর কতিপয় ব্যক্তি খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। এর মাঝে এক খুদে বালক দুর্বল পায়া যুক্ত ততোধিক দুবলা একটি বেঞ্চে বসে প্রাণপন পা নাচিয়ে চলেছে। গোটা দেহকে বেঁকিয়ে, মুচড়িয়ে বেঞ্চটি আন্দোলিত করার প্রয়াসে এবং সেই আন্দোলন থেকে উদ্ভুত বেঞ্চের ক্যাঁচর ক্যাচঁর শব্দে চারদিক মুখরিত করার আনন্দে মাতোয়ারা বাচ্চাটি। 'ঐরকম বিশ্রী আওয়াজ করবেনা। চুপ করে বসে থাক'। মেলা অফিসের কেরানিটির বকুনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলোনা ফুলোফুলো গাল আর খ্যাঁদা নাক শোভিত বিচ্ছুটি। সাদা সাদা দাঁত বের করে আহ্লাদিত চিত্তে জিভ ভেঙাতে লাগল। সামনের দুটো দাঁত আবার ফোকলা। 'পাঁচ নয়, সাতই হবে'। খুদেটির সামনের 'নেই দাঁত' দুটো লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হলো রামন। আধ খাওয়া চিনির বলটা সামনে ধরতেই ছেলেটি উড়ন্ত গুলতির বেগে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর হাত থেকে কাঠি সমেত ক্যাণ্ডিটা নিয়েই মুখে পুরে দিল যতটা পারে একবারে। গোলাপী চিনির রসে মাখামাখি হয়ে গেল মুখ। খাদ্যের প্রতি ছেলেটির এই অত্যুৎসাহ কে প্রশংসা না করে পারলোনা রামন। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। কেরানিটি ব্যাজার মুখে তাকালো রামনের দিকে। 'আপনি একে নিতে এসেছেন নিশ্চয়'?

‘হ্যাঁ’। আপনাআপনি কথাটা রামনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। ‘এখানে সই করুন’। কেরানিটি বিচ্ছুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে আর কোনো ঝুটঝামেলায় না গিয়ে রেজিস্টার খাতাটি বাগিয়ে দিলো সামনে। রামনও হিজিবিজি একটা দস্তখৎ করে দিলো।

‘আপনারা না অদ্ভুত। নিজেদের বাচ্চাদের সামলে রাখতে পারেননা? নজর রাখবেন এবার থেকে। আর যেন না হারায়। উঃ, বাচ্চা বটে একখানা। খুদে শয়তান যাকে বলে। কোনো কাজ করতে দিলোনা আমায়। আমাকে এখন মাঝরাত অবধি এখানে থেকে কাজ শেষ করতে হবে’। ভারী বিরক্ত কেরানিটি গজগজ করতে লাগলো।

‘আপনারাই তো মাইকে বললেন ছেলেটা খুব কাদঁছে’। ‘ঐ বিচ্ছু কাঁদবে? হাসালেন মশাই। ঐ রকম বলতে হয়। অনেক বাবা মা ইচ্ছে করে বাচ্চা ছেড়ে দেয় আমাদের ক্যাম্প অফিসের সামনে। তাদের মতলবখানা হলো সারাদিন বাচ্চা আমাদের জিম্মায় রেখে নিজেরা হাত পা ঝাড়া হয়ে মেলায় বেড়াবে তারপর সন্ধ্যেবেলায় ফেরৎ নিয়ে বাড়িমুখো হবে। আর বাচ্চাগুলোও এক একটা খুদে শয়তান। যাকগে, বাদ দিন ওসব। ছেলেটার মা কোথায়’? কেরানিটি একটু কৌতূহলী হলো।

‘ঐ, ওদিকে’। যেদিকে পারে হাত বাড়িয়ে দিলো রামন আর বিচ্ছুটা সঙ্গে সঙ্গে বাড়ানো হাতটা খপ করে ধরে ফেললো। বাচ্চাটার হাত ধরে জনারণ্যে মিশে গেল রামন।

খুদের হাত ধরে যেতে যেতে ‘ছেলের মা’ শব্দটি তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো। শব্দটা যেন তার নাগালের বাইরে থাকা একটি উত্তেজনাময় অস্তিত্ব। বেশ হতো যদি মেলা অফিসের বাইরে ওর ছেলের মা অপেক্ষায় থাকতো ওদের জন্য। ঐ হাঁড়িমুখো কেরানিটা ধরেই নিয়েছে ওর একটা বৌ আছে। ‘আর থাকতেই পারে’। ভাবলো রামন। ‘আমি একজন যথেষ্ট পত্নী-যোগ্য ব্যক্তি। সাইনবোর্ড আঁকার জগতে আমার মতো সুদক্ষ, মৌলিক আঁকিয়ে আর একটাও নেই। ব্যাংকে আমার ভালো টাকা জমানো রয়েছে। সরযূ নদীর পারে আমার বাড়ি আছে একটা আস্ত সাইনবোর্ডের কারখানা সমেত’।
এই বাচ্চাকে তো ও দত্তক নেবে। আর আরেকটাও খুব সম্ভব শশীকলার মতো বর্ধিতমান ডেইজির দেহাভ্যন্তরে। সেটি তার একান্ত নিজস্ব। যদিও ডেইজি খোলসা করে এখনো কিছু বলেনি তাকে, কিন্ত দিন দিনই ওর সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে এই বাবদে। যদি তার সন্দেহ সত্যি প্রমাণিত হয় তবে আচ্ছা জব্দ হবে ঐ অতি কর্ত্তব্য সচেতন, পিটপিটে জন্মনিয়ন্ত্রণ আয়োগে কর্মরতা ঘ্যানঘ্যানে মহিলাটি। সবসময় ব্যস্তবাগীশ ভাব যেন কতো কাজ বাকি। কাজের মধ্যে তো কাছেপিঠের গ্রাম বা শহরে গিয়ে লোকের বাড়ীর অন্দর মহলে ঢুকে দম্পতিদের কানের মধ্যে এই বার্তা প্রবিষ্ট করানো যাতে তাঁরা পুর্নবার সন্তানাদি জন্ম দেওয়া থেকে নিজেদের নিরস্ত রাখেন। সবসময় অহংকারে মটমট করছে আর এক নম্বরের একটা আহাম্মকের মতো সেও ল্যাজ নাড়িয়ে নাড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর পেছন পেছন। ওর মধুর বাক্যে ভুলে গিয়ে আবার শহরের, গ্রামের দেওয়ালে লিখেও দিয়েছে-দুটির পরে এখন নয়, তিনটির পরে একদম নয়। শুধু তাই নয়, ওকেও বাধ্য করেছে ওর সঙ্গে ফাঁকা ফাঁকা সব জায়গায় যেতে। এরপরও তার পক্ষে সম্ভব কৌমার্য রক্ষা করে চলা? সত্যি এটা দারুণ মজার ব্যাপার হবে জন্মনিয়ন্ত্রনের তত্বে ঠাসা মগজ নিয়ে ডেইজি যদি নিজেই তার বিপরীতমুখী পথে হাঁটা দেয়। সব তেজ জলাঞ্জলি দিয়ে কেমন গোবেচারা মুখে তার সামনে এসে দাঁড়াবে ডেইজি ভাবতেই ফিক করে হেসে ফেললো রামন। তার আঙুল ধরে হাঁটতে থাকা শিশুটিও ওকে হাসতে দেখে হেসে ফেললো। ওর আনন্দে ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে রামন জিজ্ঞেস করলো, ‘হাসি পাচ্ছে কেন’? ‘এমনি এমনি’। রামনের হাত পাকড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগলো খুদে।
এত ভীড় মেলাতে যে সামনে এগোনোই দুষ্কর। তার ওপরে খাবারের দোকান দেখতে পেলেই শিশুটির পা আঠার মতো আটকে যাচ্ছে সেখানে। আর মেলাটিও সেরকম। দু পা যেতে না যেতেই শুধু হরেক রকম খাবার আর লাল, সবুজ শরবতের পশরা সাজিয়ে বসেছে দোকানীরা। কত রকম বাহারী খাবার!ঢিপি করে রাখা সবুজ লঙ্কার বড়া- শশা আর টমেটো কুচি দিয়ে সাজানো, নানারকম সবজির ভাজি, চড়বড়ে তেলে ভাজা চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী করা

মুচমুচে আপ্পালম- পূর্নচন্দ্রের মতো সুগোল, সোনালী রঙের সদ্য ভাজা গরম জিলিপী, সব থরে থরে সাজানো রাস্তার দুধারে। এইরকম মনোমুগ্ধকর দৃশ্য আর সুঘ্রাণে বড়রাই প্রলুব্ধ হয়, শিশুরা তো কোন ছার।

বাচ্চাটিকে লোভার্ত নয়নে খাদ্যসামগ্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করতে দেখে এক অভূতপূর্ব বাৎসল্যস্নেহে সিঞ্চিত হয়ে উঠলো রামনের মন। 'কিছু খেতে ইচ্ছে করছে'? ঢক্ করে ঘাড় নাড়লো শিশুটি আর সঙ্গে সঙ্গে রঙিন কটন-ক্যাণ্ডি গুলোর দিকে আঙুল তুলে দেখালো। ওর আরেকটা হাত শক্ত করে ধরে রইলো রামন পাছে আবার সে না হারিয়ে যায়। লাল রঙের কটন-ক্যাণ্ডিটা পেয়েই জগৎ সংসার ভুলে আস্ত মুখ ডুবিয়ে দিলো তাতে। ক্যাণ্ডিটা ফুরোতেই রামন শুধোলো, 'আইসক্রিম চলবে'? বিচ্ছুর কিছুতেই আপত্তি নেই। অতএব রামন এবার দুটো চকোলেট আইসক্রিমের কোন্ খরিদ করে শিশুটিকে সঙ্গদান করতে লাগলো। কুয়াশার চাদর ফুঁড়ে যেমন হঠাৎ সূর্য বেরিয়ে আসে, তেমনি যেন রামনের বর্তমান দিন যাপনের বিষাদময়, একঘেয়েমির কালো পর্দা যেটা তার প্রতিদিনকার সকাল, দুপুর, রাত প্রায় ঢেকে ফেলার জোগাড় করেছিল, সেটা ভেদ করে আনন্দের এক চিলতে রোদ আবার তার জীবনে প্রবেশ করতে চলেছে। তার এই হঠাৎ ঘটে যাওয়া মানসিক পরিবর্তনে অবাক হয়ে সে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে, 'হলো কি আমার। বাচ্চাটার আনন্দ দেখে আমার এত আনন্দ হচ্ছে কেন? কে হয় ও আমার? হয়তো গত জন্মে ও আমার ছেলে ছিলো'। রামন এবার ভাবতে বসলো আর কি কি উপায়ে ছেলেটির মনোরঞ্জন করা যায়। 'নাগরদোলায় চড়বে'? পাশেই ঘ্যানঘ্যানে একটানা একটা শব্দ করতে করতে মস্ত উঁচু একটা নাগরদোলা ঘুরেই চলেছে। খুদে মহাখুশী। রামন ওকে ভেতরদিকে ঠেলে নিজে বসলো ধারে। শক্ত করে ধরে রাখলো ওর হাত। 'এটা ওটা চড়িয়ে, নানারকম খেলা দেখিয়ে ওকে খাদ্যবস্তু থেকে একটু দূরে সরিয়ে রাখতে হবে'। মনে মনে ভাবতে লাগল রামন। বেশী খেয়ে পেটের অসুখ করলে ও নিজেকেই ক্ষমা করতে পারবেনা। শিশুটির স্বাস্থ্য যথেষ্ট উদ্বেগের মধ্যে রাখলো রামনকে। ছেলেটি মনে হয় অতটা মা, বাবা ঘেঁষা নয়। আবার হয়তো বাবা মাই নেই। ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছিলো মেলায়। অবশ্য এখন আর ওকে অনাথ শিশু বলা যাবেনা। দস্তুর মতো সে আছে ওর পিতৃতুল্য হয়ে। ও খুদেকে শেখাবে তাকে আপ্পা বলে ডাকতে। নাগরদোলা যত উঁচুতে ওঠে রামনের আকাশ কুসুম কল্পনা তত ডানা মেলে উর্ধগামী হতে থাকে। বালকটি নাগরদোলা বেশী উঁচুতে উঠলে ভয় পেয়ে আঁকড়ে ধরে ওর হাত। 'ভয় পেয়োনা খোকা। এইতো আমি। আনন্দ করো'। মৃদুস্বরে বলে রামন। 'লোকে যদি বলে এই বাচ্চাকে তুমি পেলে কোথায় তাহলে বুক ফুলিয়ে বলবো ও আমার ছেলে। ডেইজি ওর মা। ওর মাথায় কি খেয়াল চাপলো ছেলেকে রেখে এলো কনভেন্টে। নাকি ওখানে ভালোভাবে মানুষ হবে। আমি নিয়ে এসেছি ছেলেকে ওখান থেকে। বাচ্চা সবচেয়ে ভালো মানুষ হয় বাড়ির পরিবেশে'।

'খোকার মা কোথায়'? কেউ জিজ্ঞেস করতেই পারে। ডেইজির প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থে সে তখন উত্তর করবে, 'কে জানে কোন আহাম্মকের সঙ্গে পালিয়েছে'। ডেইজি কম মানসিক যন্ত্রনা দেয়নি তাকে। এতদিন ধরে তার সঙ্গে মেলামেশা করে বিয়ের ঠিক আগের দিন বলে কিনা এখনো বিয়ের জন্য সে প্রস্তুত নয়। 'তাহলে মিশলি কেন এতদিন ধরে'? রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে রামন। পাশে বসে থাকা ছেলেটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ রামন জিজ্ঞেস করে ওঠে, 'বয়স কত তোমার'? ছেলেটি প্রশ্ন শুনে চোখ পিটপিট করে। রা কাড়েনা কোনো। 'সাত বছরের বেশী ককখোনো নয়। নিজেই উত্তর করে সে।পরক্ষণেই এই চিন্তার উদয় হয় মনে, ডেইজি তো মোটে দু তিন বছর এই শহরে এসেছে। তখনিতো ডেইজির সঙ্গে ওর আলাপ। তাহলে ওদের দুজনের ছেলের বয়স সাত হয় কি করে? নাঃ, অন্য লাইনে ভাবতে হবে। 'আর কতক্ষণ নাগরদোলা ঘুরবে'? খোকার কথায় রামনের মনে হলো ওর বোধহয় আর নাগরদোলায় চড়তে ভালো লাগছেনা। যাইহোক নাগরদোলার থেকে ওর মনোযোগ সরানোর জন্য রামন ওকে বললো, 'আমার বাড়িতে আসবে তুমি'? 'আমি খাব। খুব খিদে পেয়েছে আমার'। রামনের প্রশ্নের ধারকাছ দিয়েই গেলোনা খুদে। বাচ্চাটির এই ঘন ঘন ক্ষুধা উদ্রেকে বিস্মিত না হয়ে পারলোনা রামন। তবুও আরেকবার চেষ্টা চালালো। 'তুমি আমার বাড়ি এলে দেখবে থরে থরে খাবার সাজানো তোমার জন্য'। 'চকলেট না আইসক্রিম না বাবলগাম'? খুদে যথেষ্ট উৎসাহী এখন। 'সব, সব। তার ওপর আছে এই এত্ত জিলিপি'। 'জিলিপি খেতে আমি খুব ভালবাসি'। ফোকলা দাঁতে হাসে খোকা। 'আচ্ছা, আমি কি যখন খুশী খেতে পারি নাকি তোমাকে জিজ্ঞেস করে খেতে হবে'? খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত

খুদে। 'না, না। ওসব কিছুই করতে হবেনা তোমার যখন খুশী যে কটা ইচ্ছে খেও'। খুবই উদার রামন। দৃশ্যটা কল্পনা করে জিহ্বা রসনাসিক্ত হয়ে উঠলো বালকের। 'বাবা বলে অত খেলে আমার শরীর খারাপ হবে'। রামন নড়েচড়ে বসলো 'বাবা' শব্দটা শুনে। 'কোথায় তোমার বাবা? এই মেলাতেই নাকি'? খোকা কিন্তু 'বাবা' নামক বিষয়টি নিয়ে আর বেশীদূর এগোলোনা। হয়তো ভাবলো ঐ লোকটা তাকে বাবার হাতে সমর্পণ করে দেবে আর চকলেট, বাবলগামের সম্ভার ও মরীচিকার মতো মিলিয়ে যাবে শূন্যে। 'ঠিকই তো। অত খেতে নেই। পেট ব্যথা করবে'। রামন বললো।

'না, করবেনা'। নিশ্চিন্ত কন্ঠে বলে শিশুটি। 'যখন আমার মামা এসেছিলো আমাদের বাড়ি, জানো, আমি কতটা খেয়েছিলাম মামার সঙ্গে? এই এতটা'। দুদিকে হাত ছড়িয়ে পরিমাপ বোঝায় সে। ছেলেটির ঔদরিক স্বাস্থ্য নিশ্চিন্তে রাখলো রামনকে। যাক, ঘন ঘন ছেলেকে নিয়ে মালগুড়ি মেডিকেল সেন্টারের ডঃ কৃষ্ণার কাছে দৌড়তে হবেনা। বাড়িতে সেতো পুরো একা। ছেলের শরীর খারাপ হলে সামলাবে কি করে একা একা? ও ভালো কথা মনে পড়েছে। ছেলেকে একটা আলাদা ঘর দিতে হবে। ডেইজির জন্য যে ঘরটা সাফা করেছিল সেটাই মনে মনে খুদের জন্য বরাদ্দ করলো।ওই ঘরে গোপু (রামনের হঠাৎ মনে পড়ে গেলো মাইকে ঐ নামই বলেছিলো বটে) তার জামা,জুতো,খেলনা,বই সুন্দর করে গুছিয়ে রাখবে। আর পরিষ্কার বিছানাও থাকবে একটা বিচ্ছুটার জন্য। ওকে একা শোওয়া অভ্যাস করতে হবে, রামন ভাবলো আর এও আশা করলো রাতে একা শুতে গিয়ে ও কাঁদবেনা। ওকে ভর্তি করে দেবে পাড়ার কলা প্রাইমারি স্কুলে। স্কুলটা অতটা ভালো হয়তো নয়। কিন্তু রামন স্কুলের বড়দিদিমনিকে ভালোই চেনে। একবার দুই বাই ছয় ফুটের একটা সাইনবোর্ড এঁকেছিলো স্কুলের জন্য । একপয়সাও নেয়নি সেইজন্য। ফ্রি তে করছে বলে কিপটেমিও করেনি। প্লাস্টিক ইমালশান আর রুপোলি পাউডারের ছিটে দিয়ে এঁকেছিলো সাইনবোর্ড খানা। জব্বর হয়েছিলো দেখতে! স্কুলটা রাস্তা পার হয়ে মন্দিরের কাছে। ছেলেকে একাই যাতায়াত করতে হবে আর ছুটির পর ফাঁকা বাড়িতে ফিরতে হবে। কিছু করার নেই। রামন তখন তার কারখানায়।

একটা সুতীব্র হৃদয়ভেদী বেদনা হঠাৎ রামন অনুভব করলো। ডেইজি যদি তার জীবনে না ঢুকতো আর তার জীবনকে এতটা তালগোল না পাকাতো তাহলে তার পিসী এখনো তার সঙ্গে থাকতেন। ছোটবেলা থেকে সে তো পিসীর কাছেই বড় হয়েছে। তার কি উচিৎ ছিলনা শেষ বয়সে পিসীকে দেখা? ডেইজিকে দেখে কেন যেন পিসীর মনে হলো এবার তাঁর সময় এসেছে ভাইপোর জীবনের নতুন দাবীদারকে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার। সব ছেড়েছুড়ে কাশীবাসী হলেন তিনি। আহা, কি সুন্দর বাড়ি সামলাতেন পিসী! সকালের জলখাবার থেকে রাতের আহার মুখের কাছে প্রস্তুত সবসময়। দিনে বা রাতে যত উটকো সময়েই রামন বাড়ি ফিরুকনা কেন পিসী সবসময় হাসিমুখে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে। বিরক্তির লেশমাত্র নেই মুখে অসময়ে বাড়ি ফেরার জন্য। লক্ষীশ্রী ছিলো তখন বাড়িতে। আর এখন প্রকৃত লক্ষীছাড়া সে। বেশীর ভাগ দিনই থাকে না খেয়ে পকেটে রেস্ত থাকা সত্ত্বেও। সারাদিন পরিশ্রমের পর বাড়ি ফিরে কফি শুদ্ধ বানাতে ইচ্ছে করেনা। পাশেই একটা হোটেল আছে বটে।কিন্তু ওখানকার লোকগুলো এত ঘ্যানর ঘ্যানর করে একই বিষয় নিয়ে আর এত সংকীর্ণমনা যে মেশার অযোগ্য। কপালটাই মন্দ তার। কে জানতো ডেইজি এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করবে। হঠাৎ করে যেন এক চরম শূন্যতা নেমে এসেছে ওর জীবনে। সামনেটা যেন খাঁ খাঁ করছে মরুভূমি সম। হতাশার কালো আবরণে ঢাকা, একঘেঁয়েমিতে ভরা, পরিকল্পনাহীন এই জীবনের ভার ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠছে তার কাছে। প্রতিদিন সকালে উঠে মনে হয় আরেকটা অভিশপ্ত দিন শুরু হলো। গোটা বাড়িটা জীবনের স্পন্দন বিহীন। আগে পিসী সকালবেলায় চাল, গম উঠোনে ছড়িয়ে দিতেন নিয়ম করে আর পাখপাখালীর মেলা বসে যেত ভোর হতে না হতে। আর এখন? একটা চড়ুইও আসেনা। বাড়ির এই খাঁ খাঁ ভাব যেন গিলে খেতে আসে রামনকে। রামনের মাঝেমাঝে মনে হয় ওর জীবনটা যেন ইতিহাসের পটের মতো পরিবর্তনের স্রোতে ভাসমান এক জলযান। তার মজবুত কাঠামো ক্ষয় হতে হতে একদিন প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনে পরিণত হবে।

তবে সবকিছুই একলহমায় পাল্টে যেতে পারে একটি শিশুর যাদুস্পর্শে। শিশুটির হাসিখেলায় মুখরিত হয়ে উঠবে তার শূন্য অঙ্গন। লক্ষ বাতিতে আলোকময় হয়ে উঠবে তার অন্ধকার ঘর। তার বাড়ির বেশ কয়েকটা বাল্ব ফিউজ হয়ে গেছে। আরো উজ্জ্বল আলো লাগাবে সে। পিতার স্নেহ দিয়ে বড় করবে গোপুকে। মার্জিত, রুচিসম্পন্ন, সংস্কৃতিমনস্ক

একজন সুযোগ্য নাগরিক করে গড়ে তুলবে তাকে। ডেইজি বিদায় পর্বোত্তর খুব গাফিলতি হয়ে গেছে কাজে। আবার পুরনো খদ্দেরদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। রোজ সকালে কারখানায় গিয়ে সাইনবোর্ড আঁকতে হবে। ছেলেটাকে বড় করে তুলতে অনেক টাকা রোজগার করতে হবে। আর একটু বড় হলে ছেলেকে ভর্তি করে দেবে উটির নামকরা লাভডেল বোর্ডিং স্কুলে। তার ধূসর জীবনে আবার পড়বে রঙের ছোঁয়া ঠিক যেমনটি সে সাইনবোর্ড রাঙিয়ে তোলে নানা রঙের ছটায়।

'গোপু, তোমাকে না আমি একটা খুব ভালো স্কুলে পাঠাব। কত বন্ধু পাবে সেখানে'। নাগরদোলায় শেষ পাক খেতে খেতে বলে রামন। রামনের কথা শুনে মুখ ফোলায় খুদে। 'না, আমি কক্‌খোনো স্কুলে যাবনা। স্কুলে যেতে আমার একটুও ভালো লাগেনা'। 'কেন'? 'ওখানে মারে'। রামন ওর ভয় ভাঙানোর চেষ্টায় হদ্দ হয়ে গেলো। ভীষণ একগুঁয়ে ছেলে। শেষে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কান্না জুড়তে হাল ছেড়ে দিলো। 'ঠিক আছে বাবা। তোমাকে স্কুলে যেতে হবে না। চকলেট খাবে তো'? এবার হাসি ফোটে গোপুর মুখে। চেটিয়ার স্টোরে যেতে যেতে মনে মনে আঁক কষতে থাকে রামন। 'সময় লাগবে খানিকটা। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। রাজী হবে আস্তে আস্তে। আমিওতো স্কুলে যেতে চাইতামনা'।

নাগরদোলার পর এবার টয়-ট্রেনের পালা। খোকার সফর সঙ্গী যথারীতি রামন। একবার ঘুরে সাধ মিটলোনা। বিচ্ছু কিছুতেই নামবেনা। অগত্যা চার চারবার পাক দেওয়া হলো। রামন, খোকা দুজনেরই মেজাজ খুশ। এমনকি ডেইজিকেও প্রায় ভোলার জোগাড়। টয়ট্রেন ভ্রমন আশ মিটিয়ে হওয়ার পর আবার আরেক প্রস্থ খাওয়ার পালা চললো। রামন লক্ষ্য করলো বিচ্ছুটার সঙ্গে তারও সমানতালে মুখ চলছে। অথচ মেলায় আসার আগে সকালবেলায় তার কিছুতে রুচি ছিলোনা। সেই তার মন এখন ফুরফুরে, পাখীর পালকের মতো হাল্কা। 'গোপুর সঙ্গ একেবারে টনিকের মতো চাঙ্গা করে দিচ্ছে আমায়', ভাবলো রামন।আরো সতেজ হবে সে যখন খোকা তার বাড়িতে তার সঙ্গে থাকতে শুরু করবে। কাজের সময় ছাড়া বাকীটা সময় সে অতিবাহিত করবে তার সঙ্গে। কত গল্পের বই কিনে আনবে তার জন্য। সেগুলি পড়ে শোনাবে। রামায়ণের গল্প বলবে। ছেলেটি হঠাৎ একটা মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। সেখানে বিশাল কড়াইতে ডুবো তেলে আটার লাড্ডু ভাজা হচ্ছে আর সোনালী রঙের ভর্জিত মিষ্টান্ন থরে থরে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে পাশের পাত্রে। হাতে টান পড়ার সঙ্গে কল্পনার সূতোতেও টান পড়লো রামনের। 'না গোপু, আর না। অনেক খাওয়া হয়ে গিয়েছে'। রামনের কন্ঠস্বরে দৃঢ়তার আভাস। ওর ভয় হলো আর কিছু পেটে ঢোকালেই সমস্ত বমি হয়ে বেরিয়ে যাবে। আর ওর নিজেরো কেমন অস্বস্তিকর ভাবে পেটটা গুড়গুড় করছে। পাশেই একটা ছোট সার্কাসের তাঁবু পড়েছে। সেখানে খোকাসমেত গেলো রামন। সেখানকার টিয়েপাখী আর কুকুরের খেলা দেখে মহাখুশী বাচ্চা। একটা ধাতব গ্লোবে ঘূর্ণনরত মোটর সাইকেল আরোহীর সাহসিকতায় পরিপূর্ণ নানাবিধ ক্রীড়ানৈপুণ্যে আকৃষ্ট হয়ে উত্তেজনায় চিৎকার করে শিশুটি।

অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করছে রামন ছেলেটা মহা দুষ্টু। সুযোগ পেলেই দুষ্টুমি। স্টলের সামনে সাজিয়ে রাখা ফুলের টব পা দিয়ে উল্টে ফেলছে। দোকানে সাঁটা পোষ্টার টেনে ছিঁড়ে ফেলছে। ফাঁকা জায়গা পেলেই ডিগবাজি খেয়ে নিচ্ছে গোটা দুচ্চার। মেলার মধ্যিখানে একটা ফোয়ারা করা আছে। ওর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যেসব বাচ্চারা যাচ্ছে ফোয়ারার ধারকাছ দিয়ে, বেশ করে জল ছিটিয়ে দিলো তাদের গায়ে। নিরীহ গোছের তার বয়সী একটি শিশু দিব্যি চলেছে বাবা মায়ের হাত ধরে। কথা নেই বার্তা নেই গোপু রামনের হাত ছাড়িয়ে ছুটলো সেদিক পানে। প্রাণে বাসনা পায়ে পা দিয়ে হোঁচট খাইয়ে উল্টে দেবে তাকে। একটা ফোলা গাল মিষ্টি মেয়ের বিনুনী ধরে দিলো হ্যাঁচকা টান। ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে লাগে সে। গোপুর তাই দেখে আনন্দ আর ধরেনা। রামন এসব দেখে বাইরে কঠোর হওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু ভেতরে ভেতরে মজাই পায় বিচ্ছুর বাঁদরামিতে। আবার ভয়ও হয় কেউ যদি ওর দুষ্টুমিতে অসহ্য হয়ে চড়চাপড় দিয়ে দেয়। 'আসলে অন্য বাচ্চাদের তুলনায় ও একটু বেশী দুরন্ত। স্কুলে ঢুকলে সব ঠিক হয়ে যাবে'। ভিড় ঠেলে গোপুর হাত শক্ত করে ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবে রামন।

ঘুরতে ঘুরতে এবার তারা এলো মেরি-গো- রাউণ্ডের কাছে। 'আমি ঘোড়ায় চড়বো'। বিচ্ছু ঘোষণা করলো। রামন ফাঁপরে পড়লো। ওর আর একবিন্দুও ইচ্ছে নেই ঘোড়ার পিঠে চড়ার। এদিকে দুষ্টুটাকেও একা ছাড়তে ভয়। কখন, কোথায় কি করে বসে। 'না সোনা আর না। তুমিতো নাগরদোলায় চড়েছো। একই জিনিষ'। ওর কাতর অনুনয়ে কর্নপাত না করে অবাধ্য টাট্টুঘোড়ার মত পদদাপ করে খোকা। 'না,না, আমি চড়বোই'। কি করে এই গম্ভীর পরিস্থিতি মোকাবিলা করবে বুঝেই পায়না রামন। যদিও জানে খোকার আর ভোজন নিরাপদ নয় তবুও লোভনীয় খাদ্য, পানীয়ের টোপ রাখে সামনে। ছেলেটি শুধু নাকে কাঁদে, 'না, আগে ঘোড়া তারপর খাওয়া'।

'দেখোনা, ওখানে কি সুন্দর জন্তু জানোয়ারের সিনেমা দেখাচ্ছে। চলো দেখি'। নকল উত্তেজনায় চেঁচায় রামন। খুদে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে সামনে কালো মাথার সারি। কিছুই দেখা যায়না। রামন আশ্বস্ত করে, 'আমি তোমাকে এতটা উঁচু করবো। তুমি অন্যদের থেকে ভালো দেখতে পাবে'। জোর করে কাঁধে তুলে ভিড়ের দিকে এগোয় রামন। 'ঘোড়া, ঘোড়া', করে চেঁচায় খুদে আর রামন বলে, 'আগে বাঘ আর বাঁদর দেখো। নাহলে ওরা চলে যাবে। তারপর ঘোড়া'।

ছেলেটি বেশ ভারী। তার জুতোর তলার কাদায় নোংরা হয়ে যায় রামনের জামা। ক্রমাগত পা ছুঁড়তে থাকে সে। কিন্তু রামনও এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যেভাবেই হোক ওকে মেরি-গো-রাউণ্ডের থেকে দূরে নিয়ে যেতে হবে। কাঁধে বোঝা নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এগোয় রামন। ভীড়ের মধ্যে একটা সুবিধেজনক জায়গায় দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। কি ছবি চলছে কিছুই ঠাহর হয়না সামনে এত মানুষের মেলা। তবুও ভাবে তার কথামতো নিশ্চয়ই বাঘ, বাঁদরের সিনেমা হচ্ছে। না হলে তো খোকার বিশ্বাসভঙ্গ হবে। তাকে মিথ্যেবাদী ভাববে। 'গোপুবাবা, কি দেখছো'? 'কোনো বাঁদর নেই'। সুউচ্চ আসন থেকে উত্তর গোপুর। 'একটা লোক বল খেলছে। আমাকে একটা বল কিনে দেবে'?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবা, নিশ্চয়ই দেবো'। সিনেমা দেখতে আসার সময় ওর একটা প্লাস্টিকের দোকান চোখে পড়েছিলো।একটা নয়। ও দুটো বল কিনবে। একটা থাকবে সংরক্ষিত। একটাতো হারাতেই পারে।

হঠাৎ তার সুউচ্চ অধিষ্ঠান থেকে খোকা প্রাণপনে চেঁচিয়ে উঠলো, 'মা'! সেই চিৎকারের অভিঘাতে রামনের পুরো শরীর কেঁপে উঠলো।ওর কাঁধ থেকে হাঁচড় পাঁচড় করে নেমে ভীড়ের মধ্য দিয়ে জ্যা মুক্ত তীরের মতো ছুটলো খুদে। জীবন বিমা স্টলের পাশে মেলার একমাত্র ঘাসে ঢাকা ফাঁকা একটুকরো জমি। সেখানে একটা দল বিশ্রাম নিচ্ছে। রামন গেলো খোকার পিছুপিছু। দলের মধ্যে রয়েছে একজন তাগড়াই চেহারার মানুষ। দেখে মনে হয় কৃষক। তার পাশে বসে বাদামী রঙের শাড়ী পরা মাঝবয়সী এক মহিলা আর দুটি অল্পবয়সী মেয়ে। সঙ্গে ব্যাগ ভর্তি জিনিষ। মেলা থেকে কেনা হবে। দেখে মনে হচ্ছে সকালবেলায় তারা এসেছে। সন্ধ্যের বাস ধরে ফিরে যাবে গ্রামে। বিচ্ছু এবার ঢুকে পড়েছে ওদের মাঝে। সবাই গোল হয়ে ঘিরে ধরেছে ওকে। উত্তেজিত কন্ঠে নানা প্রশ্ন করছে। মেলার হৈ হট্টগোল ছাপিয়ে উঠছে ওদের গলা। খানিকদূর থেকে রামন শুনতে পেলো ছেলেটির বাবা তর্জনগর্জন করছে। 'কোন চুলোয় গিয়েছিলি, হতভাগা? তোর জন্য আমাদের বাস ফেল হলো'। কান মুলে ঠাস করে এক চড় কষালো বাবা। এই দৃশ্য সহ্য করা মুশকিল হলো রামনের পক্ষে। লোকটা আরেকবার হাত ওঠাতেই ছেলেটির মা তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করে ছেলেকে টেনে নেয় বুকে। উদ্যত হাত থেমে যায় মাঝপথে।

রামন বোঝে তার স্বপ্নের এখানেই ইতি। শ্লথপায়ে সে চলতে থাকে মেলার বেরোনোর গেটের দিকে, সরযূর পারে তার নগ্ননির্জন কুলায় অভিমুখে।

****

বাদলের একদিন

মদনমোহন ঘোষ

কদিন ধরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। ঠাকুমা বললেন, “এ বৃষ্টি সহজে ছাড়ছে না, বুধবারে শুরু হয়েছে বলে কথা। শনিতে সপ্তা, মঙ্গলে তিন, একে বুধে পনেরো দিন”। অর্থাৎ এ-বৃষ্টি এখনও অনেকদিন চলবে। বাদলের অবশ্য বর্ষার দিন গুলো ভালোই লাগে। তবে এটা যেন অসহনীয় হয়ে পড়ছে। তবু কে আটকায় ওকে। মাথায় একটা কলাপাতা ধরে পায়ের চটি-জোড়া হাতে নিয়ে স্কুলে চলল সে। বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে কয়েক মিটার গেলেই সদর দরজা। ওখানে গেটের শেডের নিচে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে একটা লম্বা দৌড়ের জন্য তৈরি হয়ে নেয়। তারপর এক ছুটে পুরনো জমিদার বাড়ির ঘুলঘুলির ভেতর ঢুকে পড়ে। এখানেও ভাঙা ছাদ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। লাল ইটের দেওয়াল থেকে চুইয়ে চুইয়ে জল পড়ছে। এখান থেকে পণবদ্ধের রান্নার ঘরের ভিতর দিয়ে গিয়েই পূজোয় দালান। দালান থেকে এক লাফে স্কুলের বারান্দায় পৌঁছে যায় বাদল। বর্ষার দিনে এটাই সহজ পথ। প্রায় চার দশক আগের গ্রাম বাংলায় পাড়ার কাকা-কাকিমার ঘরের ভেতর দিয়ে বাড়ির সীমানা পেরিয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল বিশেষত এমন বাদল দিনে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ইছামতী নদীর পাড় বেয়ে এই গ্রামে প্রায় প্রতি বর্ষাতেই লাগামছাড়া বৃষ্টি আর সঙ্গে নদীর বাঁধ ভাঙা জলে অনেক পরিবারকেই বাস্তু-চ্যুত হতে হয়। তখন এই স্কুলেই ওদের সাময়িক আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে।

সেদিন শুক্রবার, দুপুর বারোটায় টিফিনের ঘন্টা পড়তেই তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে এসেছে সে। কোরান অনুযায়ী শুক্রবার পবিত্র দিন। মুসলমান ধর্মানুরাগী ছাত্র ও শিক্ষকরা এই সময় গ্রামের মসজিদে নমাজ পড়তে যান। তাই পঞ্চাশের দশকে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলের শুরু থেকেই শুক্রবারে এই নিয়ম চলে আসছে। অন্যান্য দিন টিফিন হয় দুপুর একটায়। চল্লিশ মিনিটের জন্য। কিন্তু শুক্রবারে টিফিন হয় এক ঘন্টার জন্য। এখন আকাশটা ফর্সা হলেও কয়েকদিন অবিরাম বৃষ্টিতে গ্রামের চারিদিকে খানাখন্দ, খালবিল, ডোবা-পুকুর সব ভরে গেছে। এই জল সরাতে না পারলে বন্যা নিশ্চিত। টিফিনের বিরতির এই সময়ে বাদল দৌড়ে চলে যায় খালপায়ের স্লুইস গেটে। জমে থাকা জল খাল দিয়ে বের করে দেওয়ার জন্য ইছামতীতে ভাটার সময় এই গেট খুলে দেওয়া হয় আবার জোয়ারের সময় বন্ধ করে দেন দুই জন পঞ্চায়েত কর্মী, নুফুল ভাই কিম্বা সুকুমার কাকা। জলের তীব্র স্রোত আর শব্দে এলাকাটা মেতে ওঠে। অনেকবার অনুরোধ করলে নফুলভাই কখনও সখনও বাদলকে গেট খোলা বা নামানোর কাজে সাহায্য করতে দেয়। ওরা ভয় পায় কোনভাবে যদি বাদল গেটের নিচে পড়ে যায় বা আঘাত পায়। কিন্তু বাদলকে না করে পার পাওয়াও মুশকিল। কি জানি কি যাদু আছে ওর মধ্যে। গেটের চাকাটা কয়েক পাক ঘুরিয়ে বাদল নেমে আসে গেট থেকে।

ততক্ষণে স্কুলের সহপাঠী ও পাঠিনীরা পাশের তেঁতুল তলায় এসে জমা হয়েছে। কেউ কেউ ঢিল মেরে তেঁতুল পাড়ার চেষ্টা করছে। মায়া ও বুলবুলি একটা ডাল ধরে তার থেকে তেঁতুল পাড়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। খানিকক্ষণ দেখার পর হাত লাগায় বাদল। বেশ কয়েকটা তেঁতুল পাড়ল ওরা। সুভাষ, শিব এবং সুবলও এগিয়ে এলো। শিবনাথ পকেট থেকে বীট-নুনের পোটলা বের করল। সবাই বাঁ হাত পেতে রইল। নুন পেয়ে তেঁতুল খেতে খেতে সবাই স্কুলের দিকে চলল।

গাজীতলা পেরিয়ে গোপালদেবের মন্দিরের কাছে আসতেই ওয়ার্নিং বেল শোনা গেল। ওয়ার্নিং বেল শেষ হতে না হতেই আবার ঢং ঢং ঢং করে বেল বাজতে থাকল। আরে এটা তো ছুটির ঘন্টা। কি হল এখনই ছুটির ঘন্টা কেন? বাদল দৌড়ে চলল। স্কুল ফাঁকা। হেডস্যার একহাতে ছাতা অন্য হাতে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে আসছেন। টিফিনের পরেই হেডস্যারের ক্লাস ছিল। বাদল বলল, “স্যার, আমাদের বাংলা ক্লাস নেবেন না?” “না, স্কুল ছুটি দিয়েছি”- হেড স্যার

বললেন। “কেন স্যার? কি হয়েছে? – বাদল পাল্টা প্রশ্ন করে। হেড স্যার একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, মসজিদের কাছে ইছামতীর বাঁধ ভেঙে জল ঢুকছে তাই দূরের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে স্কুল ছুটি দেওয়া হয়েছে। বাদল বলে – “স্যার, এখন তো নদীর জল বাঁধ ভেঙে এদিকে আসছে। কার্যত: এখন ভেড়ী রাস্তা বন্ধ। এদিক থেকে কেউই ওদিকে যেতে পারবে না। এখন ছুটি দেওয়ার কোনও মানে হয় না। বরং দু'ঘন্টা পরে ভাটায় জলস্তর নেমে গেলে এই পথ দিয়ে যাওয়া যাবে। আশু, ভবনাথ ও আরও অনেকে হরিহরপুর থেকে আসে, স্যার। ওরা কোথায় যাবে এখন? ওরা এখন বাড়ি ফিরতে পারবে না”। হেডস্যার এবার প্রচণ্ড রেগে গেলেন। স্যারের কান ও মুখ লাল হয়ে উঠল। বাদলের হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে ওনার অফিসে নিয়ে গেলেন। বাকি শিক্ষকরা চলে গেলেও আরও দুজন সহশিক্ষক স্টাফ-রুমে ছিলেন। চেঁচামেচি শুনে ওনারা হেডস্যারের ঘরে এলেন। হেড স্যার প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ঘটনার বর্ণনা দিলেন। তাপস-স্যার বাদলকে বললেন, “তুই এখন খুব বোঝদার হয়েছিস দেখছি। শিক্ষকরা যা করেন ভালোর জন্যই করেন। যা এখন যা, দুষ্টু ছেলে কোথাকার”। বাদল এ যাত্রা রক্ষে পেল। ক্লাসে থেকে ব্যাগ নিয়ে বাড়ি চলল।

বাড়িতে এসে স্কুল-ব্যাগ রাখতেই আবার ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এলো। বাড়ির উঠোনে জল ভর্তি হয়ে গেছে। পাঁচিলের একটা নর্দমা দিয়ে কতই বা জল সরবে। বাদল বাড়ির পেছনের বারান্দায় গেল। ওদিকে বারান্দা রান্নাঘর ও ঢেঁকিঘরের মধ্য দিয়ে উঠোনে জল সরানোর আর একটা ড্রেন আছে। এই ড্রেন দিয়ে জল গিয়ে খিড়কির পুকুরে পড়ে। ওখানে গিয়ে বাদল দেখল পুকুরের জলের স্তর ড্রেনটাকে ছুঁই ছুঁই করছে অর্থাৎ আর একটু বৃষ্টি হলেই ড্রেন থেকে জল বাইরে বেরোবে না বরং বাইরে থেকে জল বাড়ির ভেতরে ঢুকবে। বাদল ভেবে পাচ্ছেনা এরপর অবস্থা কি হবে। বৃষ্টির বেগ সমানে বেড়ে চলেছে, থামার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই।

আচ্ছা এখন নব-বাবুর পুকুরের ওই ঢালু জায়গাটায় কি হচ্ছে? এই জায়গাটায় আশপাশের বাড়িঘর থেকে জল এসে পড়ে এই পুকুরে। কৌতূহলী হয়ে ওঠে বাদল। একটু দেখে এলে হয়। ঐ-তো ছাতাটা ওখানে ঝুলছে। পা টিপে টিপে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাদল।

এখন বৃষ্টিটা একটু কমেছে তবে ক্রমাগত বৃষ্টিতে জমে যাওয়া জল পুকুর ধারের ঐ সরু জায়গাটা দিয়ে তখনও পুকুরে পড়ছে। এখানে পুকুরের জলস্তরের সঙ্গে আশপাশ থেকে গড়িয়ে আসা জলস্তরেরর অল্প ব্যবধান রয়েছে তাই জল পড়ার একটা শব্দে জায়গাটাকে সরবতা দিয়েছে। নাল ফুলের পাতার উপর বসে ঝাপ কোলা ব্যাঙেরা বৃষ্টি-বন্দনা করে চলেছে। বাদল আরও এগিয়ে যেতেই ঝপ্ করে একটা শোল মাছ ডাঙায় এসে পড়ল। বাদলের সারা শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল। ছাতাটা পাশে রেখে বাদল মাছটাকে ধরতে গেল। হাতের স্পর্শে মাছটা এক লাফে আরও একটু দুরে গিয়ে পড়ল। আর একটু গেলেই খাদ দিয়ে পুকুরে পড়লে কে আর ধরে ওকে। বৃষ্টিতে বাদল ভিজে যাচ্ছে। আরও ভিজলে মায়ের বকুনি শুনতে হবে। মাছটাকে ডাঙায় রাখতে হবে। ওকে জলে ফিরে যেতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু এই বৃষ্টির জলস্রোত মাছটাকে পুকুরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে আর মাছটা তার বিপরীতে যেতে চাইছে। এক দিকে জীবন অন্যদিকে জীবনের রসদ। মুহূর্তে বাদল দুহাত আগলিয়ে ডাঙায় আরও দূরে ছুঁড়ে দিল মাছটাকে। পড়ে আছাড় খেয়ে মাছটা নিস্তেজ হয়ে পড়ল। আর তক্ষুনি বাদল মাছটাকে ধরে ফেলল। আর নয়, এর পরেও বৃষ্টিতে ভিজলে আজ আর মায়ের আর ঠাকুমার কাছ থেকে রেহাই নেই। খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল বাদল। সন্ধ্যার শাঁখ বেজে উঠল, অর্থাৎ মা এখন সন্ধ্যে দিচ্ছে। ভয় নেই কোন। তাড়াতাড়ি হাত-পা ধুয়ে পড়তে বসল বাদল।

****

আয়না

ঝর্ণা চ্যাটার্জী

ফেব্রুয়ারী মাস, চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। নরম তুষার থেকে শুরু করে শক্ত, পালিশ, পিছল বরফ, আবার কোথাও আধ-শক্ত, সব রকমের টেক্সচার। আমার হাঁটতে ভয় লাগত সেই বরফের ওপরে – পপাত ধরণীতলে হয়ে মান সন্মান হারানো আর অন্য লোকের হাসির খোরাক জোগান! অনেক সময়ে তাই চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়ে সচেষ্ট হতাম কোন সহৃদয় পুলিশ অফিসারের বাহু অবলম্বন করবার জন্য। বাইরের তাপমাত্রা দিনের মাঝখানে শূন্যের ওপরে উঠলে আমরা ভাবতাম আজ খুব 'গরম' আর রাতে নামত মাইনাস ২০ থেকে ৩০ ডিগ্রীতে। তার সাথে হাওয়া থাকলে তো কথাই নেই।

সে যাই হোক। আসল প্রসংগে আসি। রেজাইনা। ক্যানাডার মাঝামাঝি সাসকাচুয়ান প্রদেশের সমতলভূমিতে অবস্থিত মাঝারি আকারের একটি শহর। চারদিক খোলা, এখানকার লোকেরা বলে "বিগ স্কাই" (big sky) – বিরাট আকাশের নীল স্ফটিকের তৈরী উপুড় করা বাটি। চোখ এখানে বাধা পায় না। চাকরী সূত্রে প্রতি বছরে ফেব্রুয়ারী আর মার্চ মাসে দশ দিনের জন্য দু তিন বার আমার সেখানে যেয়ে থাকতে হত। চলতি কথায় "ডেপো" (Depot), বা পুলিশ এ্যাকাডেমি (Police Academy)। বেশ বড়সড় ক্যাম্পাস। অনেক, অনেক বিল্ডিং। নানা ধরণের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা সেখানে। ড্রাইভিং, বন্দুকের ব্যবহার, শারীরিক উন্নতি, লেখাপড়া আর সহস্র ধরণের পরিস্থিতির মোকাবেলা করা। নিজেকে নিরাপদ রেখে। সচক্ষে দেখেছি ট্রেনিং এর সময়ে কেউ মারাত্মক ভুল করলে সংগে সংগে অন্যদের চিৎকার "Now you are dead!" অল্প বয়সী সুকুমার-মূর্তি সব ছেলে মেয়ে – আমার দেখে বড় মায়া লাগত ওদের জন্য।

তখন আমি কাজ করতাম আর-সি-এম-পি তে (রয়াল কেনেডিয়ান মাউন্টেড পোলিস, বা জাতীয় পুলিশ বাহিনী)। আমার প্রধান কাজ নানা সামাজিক অপরাধ সম্পর্কে রিসার্চ এবং পলিসি রেকমেন্ডেশন করা হলেও তার সাথে ছোট-খাট, কিন্তু খুব ভাল লাগার মত আরও একটা দায়িত্ব ছিল আমার ওপরে।

আর-সি-এম-পি তখন এ্যাবরিজিনাল, অর্থাৎ ক্যানাডার আদিবাসীদের মধ্য থেকে অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েদের রিক্রুট করার চেষ্টা করত। যারা যোগ দিতে চাইত তাদের ১২ গ্রেড পাশ করে আসতে হোত আর তা ছাড়া একটা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হোত।

একজন অল্পবয়সী মহিলা কনস্টেবলের সাথে আমি রেজাইনাতে

দুর্ভাগ্যবশতঃ এ্যাবরিজিনাল ছেলেমেয়েদের ভাল স্কুলে লেখাপড়ার সুযোগ কমই ছিল, আর তাই কাগজে কলমে ১০, ১১ বা ১২ গ্রেডের ছাত্র-ছাত্রী হলেও লেখাপড়ার আসল মান তা দিয়ে প্রমাণ হোত না। আমার কাজ ছিল ওদের প্রত্যেকের লেখাপড়ার সত্যি কি মান তা নির্ধারণ করা আর কিছু ক্লাস নিয়ে ওদের ইংরেজী, অংক আর পাবলিক স্পিকিং-এ প্রাথমিক পাঠ কিছু শেখানো, শিখতে উৎসাহ দেওয়া (motivational encouragement), আর ঠিক মত লেখাপড়া করার পথ দেখান (effective learning strategies)। দশ দিন পরে আমি ওদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা রিপোর্ট লিখে সুপারিশ করতাম কার কোন বিষয়ে কত দিন প্রাইভেট কোচিঙ এর দরকার হবে যাতে ওরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে পারে। বাড়ি ফিরে ওরা আর-সি-এম-পি-র খরচে সেই কোচিং এর সুযোগ পেত। দূর-দুরান্ত থেকে ওরা আসত, আর প্রতি বারে আমি ২০-২৫ জনকে আমার ক্লাসে পেতাম।

শহরের ছেলে-মেয়ে নয় এরা। স্বভাবতঃ লাজুক। কিন্তু আমার সাথে খুব সহজেই ওদের একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠত। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানতাম, অনভ্যস্ত পরিবেশে অনভ্যস্ত রীতি নীতি অনুযায়ী পড়াশোনা বা যে কোন নূতন জিনিস শেখা কতটা কঠিন। ভোর বেলা ছাত্র-ছাত্রীরা কুচকাওয়াজ করত, দেখবার জন্য উঠতাম। তার পরে সারা দিন আমরা লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। কিন্তু সন্ধে বেলা আমার সহকর্মী পুলিশ অফিসারেরা ক্যাম্পাসের বারে একসাথে জমা হয়ে ড্রিঙ্ক করত আর আড্ডা দিত। আমার সেটাতে একেবারেই আগ্রহ ছিল না। সেই সময়ে আমি আমার সাময়িক বাড়িতে বসবার ঘরে বসে টিভি দেখতে দেখতে উল বুনতাম বা বই পড়তাম। আমার ছাত্র-ছাত্রীদের আমি বলে দিয়েছিলাম কারো কোনও প্রয়োজন হলে ওরা আমার কাছে স্বচ্ছন্দে আসতে পারে। বেশ ভাল লাগত যখন ওদের মধ্যে কেউ কেউ আসত। হয়তো ইংলিশ বা অঙ্কের হোম ওয়ার্ক নিয়ে কথা বলতে, বা অন্য কিছু। আজ আমি সেই অন্য কিছুরই একটা গল্প বলব।

ওদের নিজেদের অতি ছোট শহরে বা গ্রামে ওদের জীবন একেবারে অন্যরকম ছিল। রেজাইনাতে এসে ওরা প্রথম ট্রাফিক লাইট দেখেছে। আমার মত অশ্বেতকায় কোন মানুষকে দেখেছে। অনেকেই বলেছে ওদের কমিউনিটিতে ড্রাগের সমস্যার কথা, অল্পবয়সীদের ব্যাপক হারে আত্মহত্যার কথা। একবার সেই দশ দিনের মধ্যে দু বার আমাদের ক্লাসের কাজ বাদ দিয়ে চ্যাপেলে যেতে হোল, কোন ছাত্র বা ছাত্রীর আপন জন আত্মহত্যা করেছে খবর এসেছে। এই সবের জন্য ওদের প্রতি আমার আরও বেশি সহানুভূতি হোত। আমি আমার সাধ্যমত পরামর্শ দিতে বা সহানুভূতি দেখাতে চেষ্টা করতাম।

একদিন সন্ধেবেলা নানা ধরণের কথার মধ্যে একটি মেয়ে হঠাত বলল "আমার একবার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল"। ও সেদিন একা এসেছিল। আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কিরকম অভিজ্ঞতা"? একটু ইতস্ততঃ করে লিন্ডা বলল "বলব"? আমি বললাম "যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে তবে বল"।

মস্ত বড় একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ও শুরু করল। বলল "জানো, একবার আমি আমার গ্রাম থেকে কাজের খোঁজে প্রিন্স রুপার্টে যাচ্ছিলাম আমাদের গ্রামের একজন পরিচিত, বিশ্বস্ত লোকের গাড়িতে। অনেক দূরের পথ। তাই রাত্রে একটা মোটেলে থাকার ব্যবস্থা করতে হোল। ঐ অঞ্চলটার খুব দুর্নাম। ঐ হাইওয়ের নামই হয়ে গেছে 'অশ্রুজলের হাই ওয়ে'। অগণিত এ্যাবরিজিলাম মেয়েদের ঐ পথে বা তার কাছাকাছি শেষ বারের মত দেখা গেছে, তার পরে কখনও তাদের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, কখনও বা সেটাও পাওয়া যায় নি। কেউ বা হিচ হাইকিং করতে গিয়ে ইচ্ছে করে তাদের হত্যাকারীর গাড়িতে উঠে সহজ শিকার হয়েছে, কেউ বা অনিচ্ছার শিকার। দু'তিন দিন পরেও সেই মেয়ের কোন খোঁজ খবর পাওয়া না গেলে তার বাড়ির লোকেরা খুঁজতে চেষ্টা করেছে, তার পরে ...তার পরে আর কি? মৃতদেহ পাওয়া না গেলে মা-বাবা, ভাই-বোনেরা কখনও আশা ছাড়তে পারে না। তারা আশায় আশায় থাকে যে কোনও দিন হয়তো তার খোঁজ মিলবে, কোন দিন হয়তো সে ফিরে আসবে"।

"তার পর? তোমার কি অভিজ্ঞতা হয়েছিল? কিছু খারাপ অভিজ্ঞতা নয় তো"?

লিন্ডা একটুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার পরে উত্তর দিল। “না, হয়তো খারাপ অভিজ্ঞতা বলা যায় না এটাকে। কিন্তু অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, অথচ কি সত্যি!” আবার একটু নিঃশ্বাস নিয়ে সে শুরু করল।

“আমি সেই মোটেলে চেক ইন করার পরে ঘরে গিয়ে স্যুটকেস খুলে রাত্রের জামাকাপড় বার করলাম, আর স্নান করতে ঢুকলাম। স্নান সেরে বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল মুছছি এমন সময়ে মনে হোল আমার মুখের ঠিক পিছনে আর একটা কারো মুখ। অবাক হয়ে পিছন দিকে ফিরে দেখলাম, কই কেউ তো নেই! আবার আয়নার দিকে তাকাতেই দেখি আবার সেই মুখ। চেনা চেনা মনে হোল। ঠিক। এই মেয়েটি আমার পাড়ার মেয়ে, নাম জেনিফার। মাস দুই হোল তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। এবারে আমার একটু ভয় হোল। কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না তো। খুব আস্তে আস্তে পিছন ফিরে আমি বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরে গেলাম। কিন্তু শোবার জামাকাপড় না পরে আবার বাইরের জামাকাপড় পরে নিলাম, কি জানি, যদি এই ঘরে থাকতে না পারি”!

“তার পর”?

“বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরে যাবার আর জামা কাপড় পরে নেওয়ার পরে মনে হোল কেউ একজন আমাকে ইশারা করছে বাইরে যেতে। সঙ্গে একটা ফ্ল্যাশ লাইট ছিল। সেটা হাতে নিয়ে দরজা খুললাম। আবার সেই অদৃশ্য ইঙ্গিত। ভয় হওয়া সত্ত্বেও আমি এগিয়ে গেলাম। মনে হোল মোটেলের পিছনের দিকে একটা ছোট্ট জংগলের মত আছে, সেই দিকে যেতে হবে। আর আমার সাহসে কুলোল না। ফিরে গেলাম ঘরে, কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না সারা রাত। পরের দিন সকালে আমার সাথীকে বললাম যে ঐ জংগলটার কাছে একটু যেতে চাই, সে যদি আমার সঙ্গে যায়।

আমরা দুজনে সেই জঙ্গলের মধ্যে একটু খানি যেতেই দেখলাম একটি মেয়ের ছেঁড়া জামাকাপড় পড়ে আছে। একটা গাছের ডালে আটকে আছে তাই হাওয়ায় উড়ে যায় নি”।

আমি স্তব্ধ হয়ে শুনছিলাম। লিন্ডা আবার শুরু করল।

“আমাদের আর বেশি কিছু দেখার মত সাহস ছিল না। ঘরে ফিরে এসে পুলিশকে ফোন করে যা দেখেছি তার বর্ণনা দিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশের তিন চার জন অফিসার এল। জংগলের মধ্যে তারা মাটি খুঁড়ে বের করল জেনিফারের দেহাবশেষ। নিশ্চিত ভাবে সনাক্ত করা অবশ্য সেই দিনই হয় নি। ফোরেনসিক পরীক্ষা হয়, ওর বাবা-মাকে খবর দিয়ে আনানো হয়। তাঁরা সনাক্ত করেছিলেন।

আমি যে ঘরে ছিলাম সেই ঘরেও পুলিশের অফিসারেরা খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। বিছানার তলায় কার্পেটে নাকি রক্তের পুরনো দাগ পাওয়া গিয়েছিল। ওদের সন্দেহ যে জেনিফারকে কেউ সেই মোটেলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ধরে এনে সেখানেই তাকে মেরে ফেলে, খুব সম্ভবতঃ ছুরি দিয়ে। তার পরে ঐ জংগলে নিয়ে গিয়ে তার দেহ লুকিয়ে রাখে। আমি সেই ঘরেই থাকবার জন্য গিয়েছিলাম, আর জেনিফারের অশরীরি আত্মা আমাকে জানাতে চেয়েছিল তার শেষ ইতিহাস। ভেবেছিল আমি তাকে আয়নায় দেখে হয়তো চিনতে পারব”।

****

Laughter is good for your health! *

1. Don't copy if you can't paste!

A popular motivational speaker was entertaining his audience. He said: "The best years of my life were spent in the arms of a woman who wasn't my wife!" The audience was in silence and shock. The speaker added: "And that woman was my mother!"

Laughter and applause.

A week later, a top manager trained by the motivational speaker tried to crack this very effective joke at home. He was a bit foggy after a drink. He said loudly to his wife who was preparing dinner, "The greatest years of my life were spent in the arms of a woman who was not my wife!"
The wife went; "ah!" with shock and rage. Standing there for 20 seconds trying to recall the second half of the joke, the manager finally blurted out "....and I can't remember who she was!"

By the time the manager regained his consciousness, he was in a hospital bed nursing burns from boiling water.

Moral of the story: Don't copy if you can't paste!

2. Adam and Eve

A little girl asked her mother,
"How did the human race start?"
The mother answered,
"God made Adam and Eve and they had children, and so all mankind was made."

Two days later the girl asked her father the same question. The father answered,
"Many years ago there were monkeys from which the human race evolved."

The confused girl returned to her mother and said,

"Mum, how is it possible that you told me the human race was created by God, and Dad said they developed from monkeys?"
The mother answered,
"Well, dear, it is very simple.
I told you about my side of the family and your father told you about his."

3. A mathematician, an accountant and an economist apply for the same job.

The interviewer calls in the mathematician and asks “What do two plus two equal?” The mathematician replies “Four.” The interviewer asks “Four, exactly?” The mathematician looks at the interviewer incredulously and says “Yes, four, exactly.”

The interviewer calls in the accountant and asks the same question. “What do two plus two equal?” The accountant pauses for a moment to ponder the question and responds “On average, four—give or take ten percent, but on average, four!”

The interviewer finally calls in the economist and poses again, the same question. “What do two plus two equal?” The economist looks around the room, gets up, locks the door, closes the shade, sits down next to the interviewer and says “What do you want it to equal?”

4. Chinese wife, new in San Francisco, joins English speaking class.

After a few days:

Wife: Welcome home, darling.

Husband: I am so tired today.

Wife: OK. Rest in Peace.

5. Endearing term for wife

American: Do you guys call your wives "Honey" in your native language?

Indian: No, we call them "bee bee" - they sting twice as hard as the honey bee.

6. A Really Senior Driver

My neighbor was working in his yard when he was startled by a late model car that came crashing through his hedge and ended up in his front lawn.

He rushed to help an elderly lady driver out of the car and sat her down on a lawn chair. He said with excitement, "You appear quite elderly to be driving."

"Well, yes, I am," she replied proudly. "I'll be 97 next month, and I am now old enough, that I don't even need a driver's license anymore."

He asked "How do you know?"

"The last time I went to my doctor, he examined me and asked if I had a driver's

license.
I told him, yes and handed it to him."
He took scissors out of the drawer, cut the license into pieces, and threw them in the waste basket, saying, 'You won't need this anymore.'

So I thanked him and left!

** All of these jokes have been collected from various sources, and are not to be taken seriously. They don’t intend to put down or offend any one, any particular group or any profession.

****

Korean Drama

Shaony Disha Chakraborty (age 17)

From a young age, we all have been exposed to films from the Hollywood and Bollywood industries. After a long day of school, I'm always able to take a bit of time to watch my favourite television series as a way to relax and disconnect from the busy world. However, when I was in grade 9, my friend introduced me to a new world of television, known as "Korean Dramas" or "KDramas" for short. I started watching films in a language that I wasn't familiar with, and began getting exposed to the culture and traditions of Korean people. I watched a wide range of genres - romantic, historical, supernatural, family - and learned about a whole different world that I didn't even know existed. I was mesmerized by all the different stories and characters that I grew so fond of. Every day after I had finished studying and was about to go to bed, I would fit in a bit of KDrama watching time. It was a time where I could just enjoy the world of the characters in my drama and escape the worries of the world.

When I first began watching dramas, my parents would poke fun and ask me "What do you like so much about these KDramas? How can you understand what you're watching when it's a completely different language and culture?". When I contemplated that question, it suddenly struck me as to why I like KDramas so much. I was still able to connect with the characters because the stories were universal - it didn't matter what you looked like, where you came from or what language you spoke - you could understand the stories and emotions portrayed by the characters and relate with them.

One of my favourite KDramas is one called *Reply 1988*. It's about a group of five friends and their families who all live in the same neighbourhood in Seoul (capital of South Korea) in 1988. What draws me so close to this drama is that it covers so many aspects of family dynamics from brother-sister relationships to parenting, to mother's sacrifice and childhood friendships. In every episode, I found something that I related to because I had experienced it in my own life. It was admirable that even though I was an Indo-Canadian girl living in Canada in the 21st century, I still connected to the same situations and problems as the Korean characters in the 1980s.

Over the COVID-19 pandemic, I began to persuade my family to watch KDramas along with me. At first, they complained that they couldn't keep up with subtitles, but even with that, they couldn't take their eyes off the TV. It soon became one of our "Covid habits" and a way for us all to come together to enjoy these dramas.

In the year 2021, we can already see the influence of different cultures on today's society, for example, with the prevalence of "K-Pop". The new generation is starting to embrace and discover different cultures and their arts. Maybe in the future there won't be separate Western or Indian film industries, but one where all forms of art are enjoyed by everyone in the world.

I would encourage anyone who is hesitant about watching international television to just give it a try, because you'll never know what you'll end up finding. As the director of the Award winning film *Parasite* once said: "Once you overcome the one-inch-tall barrier of subtitles, you will be introduced to so many more amazing films… I think we should use only one language - the cinema.".

Desire for Freedom: A World of Our Own

Sparsho Chakraborty (Age 15)

As school has started up again, I have once more indulged into reading novels for one of my favourite subjects, English class.

In English class this year, I have been reading a novel known as *The Book Thief. The Book Thief* is a novel that follows the life of a German girl named Liesel Meminger. It shows the life of her as well as her friends and family members through the lens of death. Eventually, their life gets interrupted by the arrival of a Jewish man, Max, at the doorstep of their house.

The story shows the struggles that people in the shadow of the German *Reich* (state) had to live in. Liesel and her friends had to steal to quench their hunger. They had to brace themselves for regular bombing attacks. She had to deal with the loss of the people close to her. Liesel and her family had to protect Max in their basement. Throughout all of these hard moments in her life, reading was the only thing that pulled her out of the darkness around her.

I really connect with Liesel. The world is a very scary place to live in. I feel like we all need to disconnect with all of the stress and hardships of the modern-day rat race. Liesel Meminger used books to run away from her troubles. However, for me, I use my swim practices as well as my piano practices to escape the real world. When I swim, I feel free. I feel that I can think in peace about all the stress that I have. I like to forget about the outside world and just focus on each of the strokes that I take. Every time I play on the piano, I express myself. I can let out all my emotions from sadness to anger. I feel like the emotions that I release help me start afresh and help me stay mentally strong. The music that I play soothes me, and aids me in calming down.

Even though Liesel and I live in vastly different worlds, we can still connect through our yearning for freedom. Humans are meant to live freely. They should be able to make

their own destiny come true. Every human, no matter the circumstances, should choose their own path to take. Even if we live in different circumstances, we all desire the same things.

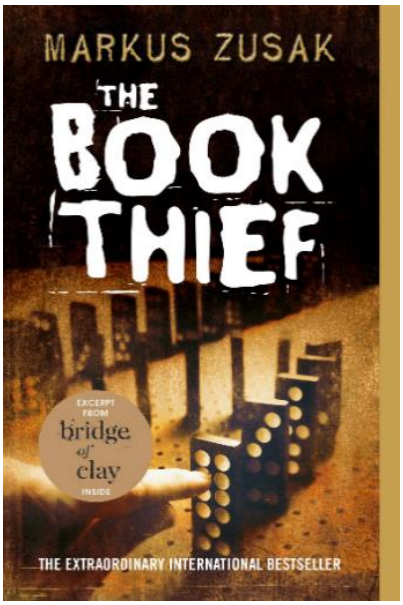

Curiosity about curiosity

Aheli Banerjee （Age 10）

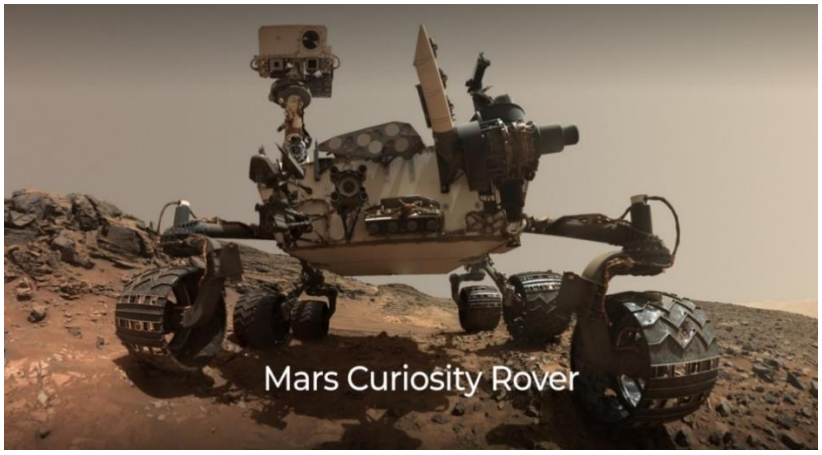

As Stephen Hawkings said “I think the human race has no future if it doesn’t go into space”.

When a rover is launched into space, it provides information about the past and future of different planets. In this case, the planet is Mars. Curiosity, (Mars Rover) was designed to explore Gale Crater on Mars as part of NASA's Mars Science Laboratory mission to find out if Mars had life. Curiosity looked for life by searching for water. Curiosity, the rover, was launched to Mars on November 26, 2011 by the NASA team and took 7 months to get on Mars.

Unlike other rovers, Curiosity had one less step to land: step 1 was launching the rover, followed by step 2 which was to deploy the rover. As they deployed the rover there were mini rockets under Curiosity and because of those rockets, the rover flew. As she flew, she took images of the surface of Mars, which led to better information about the planet. She went to different places on Mars to search for water. One of the places that Curiosity went to explore was Mount Sharp with sharp rocks, which she had to climb to find a sand dune. Though the sharp rocks created holes in the tires of Curiosity, the NASA team discovered that with holes in the tires, it was easier to get across the sand dune! After exploring the sand dune, Curiosity headed back down. As Curiosity headed back, she drilled holes in some rocks that she had found. In those rocks, she found clay.

Based on findings of Curiosity, we can say that Mars was a very wet planet because there was a lot of clay. Curiosity has been on Mars since 2012 exploring Gale Crater and acquiring rock, soil, and air samples for the NASA team to do the analysis. As on March 19, 2021, Curiosity celebrated 3,063 Martian days, or Sols, on the surface of the Red Planet. The Mission Science Team has collected together a series of pictures that record some of the rover's major achievements. Curiosity is an amazing rover, and we have learned so much about Mars because of her.

Looking Through Water Drops

Yogadhish Das

I like to go out and photograph nature. But the Pandemic has forced us all to spend more time indoors. I used my time indoors to have some fun photographing flowers and leaves through water drops. Here are a few of them.

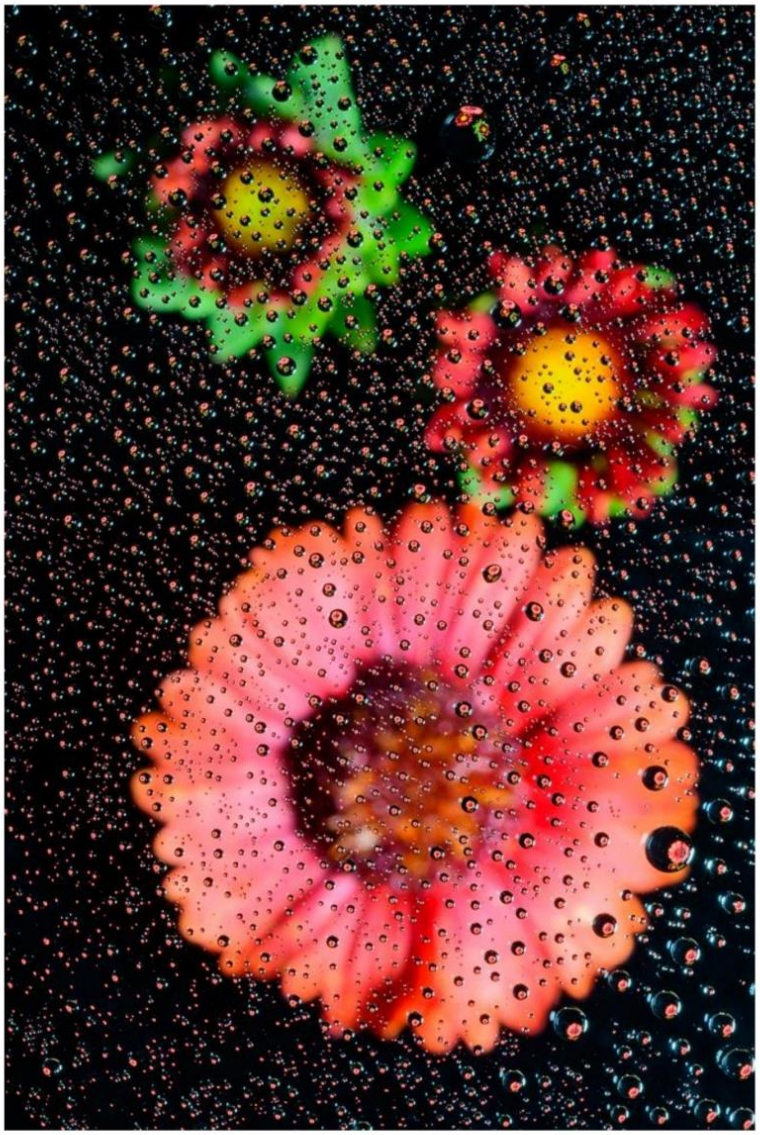

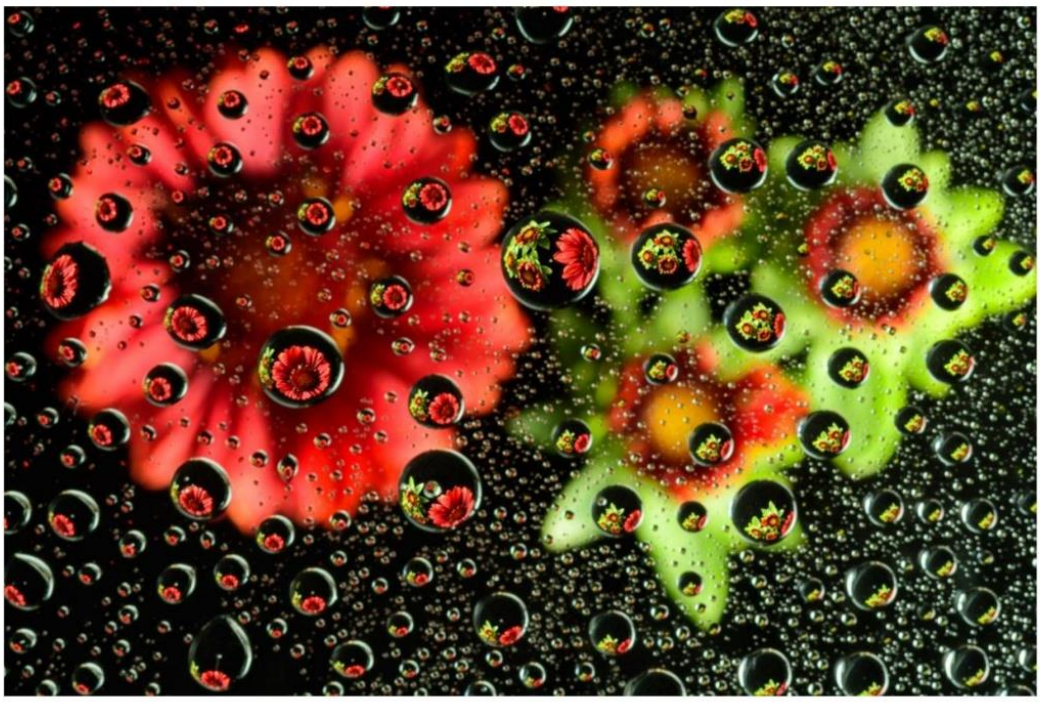

Durga Puja in Three Cities - Pune, Mumbai, Kolkata

Photos by Tanima Majumdar